আমরা যুক্তিবাদী

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি
এবং হিউম্যানিস্টস্
অ্যাসোসিয়েশন-এর মুখপত্র
বইমেলা সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১০

প্রধান সম্পাদক : সুমিত্রা পদ্মনাভন

সম্পাদক : মানসী, সন্তোষ, মৃণাল

দাম : দশ টাকা

উপদেষ্টা : প্রবীর ঘোষ

রেজিস্টার্ড অফিস :
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি
৭২/৮ দেবীনিবাস রোড, কল-৭৪
ফোন : ২৫৫৯-০৪৩৫

হিউম্যানিস্টস অ্যাসোসিয়েশন
পি ২, ব্লক বি, লেকটাউন কলকাতা-৮৯
ফোন : ২৫২১-৬২৭০

সূচি

সম্পাদকীয়/২

চয়ন :
জাতিভেদের কুফল : শিবনাথ শাস্ত্রী/৩

বিশেষ প্রবন্ধ :
পলিটিকাল ম্যানেজমেন্ট : প্রবীর ঘোষ/৫

বিশেষ প্রবন্ধ :
পরমাণু বিদ্যুৎ : বিকাশ সিংহ/১৩

ফিচার :
একদিন ট্রেনে : মৃণাল কয়াল/১৭

প্রবন্ধ :
২৬/১১ ফিরে দেখা : জয়ব্রত পান্ডা/২৩
দেহব্যবসা ও কিছু অপ্রিয় প্রশ্ন : মানসি/২৭

ফিচার :
বলিপ্রথা বেআইনী : সন্তোষ শর্মা/৩২

সংগঠন সংবাদ/৪০

রিপোর্ট :
বাংলাদেশ : মহম্মদ ইউনূস : মনীশ রায়চৌধুরী/৪২

চিঠিপত্র/৪৩

সম্পাদকীয়

১৯৭৭ থেকে ২০০০ এই তেইশ বছর তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। ভারতে আর কেউ টানা এত দীর্ঘ বছর মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকেননি। এই দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষমতায় থাকা কি তাঁর কৃতিত্ব ও জনপ্রিয়তার প্রমাণ?

এক্ষুণি হয়তো সঠিক মূল্যায়নে নেমে পড়ার সঠিক সময় নয়। কারণ আবেগের স্রোতের বিরুদ্ধে যুক্তি দেওয়ার ঝুঁকি তো আছেই। ভেসে যাওয়ার ঝুঁকি। তবুও আমাদের বাঙালিদের জীবনে ভালো খারাপ অনেক কিছুর কারিগর জ্যোতিবাবুকে নিয়ে কিছু সত্যভাষণের দায় এড়ানো যায় না।

জ্যোতিবাবুর মহৎ কর্ম গ্রামাঞ্চলে ভূমি সংস্কারের কাজে হাত দেওয়া। এই ভূমি সংস্কারের কারণেই তাঁর পার্টি গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের কাছে ‘অনাথের নাথ’ হয়ে উঠেছিল। তবে তা মাত্র পাঁচ বছরের জন্য। এই কাজ পাঁচ বছরের মধ্যে বন্ধ করে দিয়ে গ্রামে গ্রামে ক্যাডার-নির্ভর প্যারালাল প্রশাসন গড়ে তুললেন। শুরু হল পার্টি-সন্ত্রাসের যুগ। পঞ্চায়েত রাজনীতিতেও লাগামছাড়া দুর্নীতি ও পার্টি-ডিক্টেটরশিপের কলঙ্কের নায়ক জ্যোতিবাবুই।

জ্যোতিবাবুর সময়ে হাজার হাজার ছোট ও মাঝারি কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায় ভয়াবহ লোড-শেডিং ও সিপিএম পার্টির জঙ্গী ট্রেড ইউনিয়নের অত্যাচারে।

জ্যোতিবাবুর তৃতীয় ঐতিহাসিক ভুল—স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ইংরেজি তুলে দেওয়া।

চতুর্থ ঐতিহাসিক ভুল ছিল পশ্চিমবঙ্গে কম্প্যুটার প্রবেশে ব্যাপক বাধা দিয়ে অন্যান্য বহু প্রদেশের তুলনায় এই বঙ্গকে পিছিয়ে রাখা।

পঞ্চম ঐতিহাসিক ভুল মন্দির কমিটি-ক্লাব থেকে স্কুল-ইউনিভার্সিটিকে গায়ের জোরে দখল করা। মধ্যমেধার অনুপযুক্তদের প্রতিটি সরকারী উচ্চপদে বসিয়ে পার্টির চাকরবাকর তৈরি করা।

একটি ঐতিহাসিক ঠিক কাজ তিনি করেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ফাঁদে পা দেননি, বা দিতে পারেননি।

জ্যোতি বসু ভারতের বুর্জোয়া গণতন্ত্রের একজন আদর্শ রাজনৈতিক চরিত্র। তিনি বুঝেছিলেন, শ্রেণিবিভক্ত এই দেশে ধনীদের টাকায় ভোট লড়তে হবে। গরীবদের ভোটে গদি দখল করতে হবে। লক্ষ্য গদি, সাম্য নয়।

জাতিভেদের কুফল

শিবনাথ শাস্ত্রী

জাতিভেদের অনিষ্ট ফল এই হইয়াছে যে এতদ্দারা কায়িক শ্রমসাধ্য কার্যকে নিকৃষ্ট ও লোকের চক্ষে হেয় করিয়াছে। এদেশে কায়িক শ্রম চিরদিন হীনজাতিরাই করিয়া আসিতেছে; ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বর্ণেরা যে সকল কার্যকে তাঁহাদের অযোগ্যবোধে পরিত্যাগ করিয়াছেন। দেশে এই প্রথা চিরদিন প্রচলিত থাকাতে কায়িক শ্রমের প্রতি ভদ্রলোকের ঘৃণা বদ্ধমূল হইয়াছে। এই কারণে দেখিতে পাই এদেশে শিক্ষা বা অন্য কোন কারণে যাহারই অবস্থা একটু ভাল হয় সে এবং তাহার পুত্র পৌত্রগণ অমনি কায়িক শ্রমকে ঘৃণিত বলিয়া অনুভব করিতে থাকে। এই ব্যাধি এতদূর পর্যন্ত প্রবল, যে একজন ব্রাহ্মণ বা কায়স্থের সন্তান অর্থাভাবে সপরিবারে অর্ধাশনে থাকিবে অথচ কোন প্রকার কায়িক শ্রমের দ্বারা অর্থোপার্জন করিবে না। ব্রাহ্মণদিগের ত কথাই নাই, কোন ব্রাহ্মণ ভিখারীকে যদি তিরস্কার করা যায়, সে বলে, মহাশয়! ব্রাহ্মণের সন্তান খাটিয়াও খাইতে পারি না সুতরাং ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয়। ভিক্ষাতে ব্রাহ্মণের লজ্জা কি! কি ভয়ানক, যে দেশে মনুষ্যোচিত কায়িক শ্রম অপেক্ষা ভিক্ষা প্রশংসার বিষয়, সে দেশকে দুর্গতি হইতে রক্ষা করে কার সাধ্য? হে ভারতীয় যুবক। তুমি যতদিন সাহসী, কর্মঠ স্বাধীনচেতা মনুষ্যের ন্যায় নিজের মস্তকের ঘর্মে নিজের অন্ন উপার্জন করিতে না শিখিবে, জগদীশ্বর তোমাকে যে বাহুদ্বয় ও পদদ্বয় ও যে মস্তিষ্ক দিয়াছেন, তাহাদিগকে খাটাইয়া নিজ উন্নতি করিবার চেষ্টা না করিবে ততদিন তোমার দুর্গতি দূর হইবে না। ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিতে পাইবে, যে ব্রাহ্মণদিগের প্রতাপ যখন প্রবল ছিল, তখন এদেশে শ্রমজীবিদিগের উন্নতি হইতে পারে নাই।

জাতিভেদের অপর অনিষ্ট ফল এই যে, ইহাতে ভারতবর্ষকে দরিদ্র করিয়াছে। এই প্রথা নিবন্ধন সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছে সুতরাং বাণিজ্যের উন্নতি হইতে পারে নাই। সমুদ্রযাত্রা ব্যতীত আজ পর্যন্ত কোন দেশ কবে বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করিয়াছে? বোম্বাই নগরে গিয়া দেখ এ দেশের লোকে কত কাপড়ের কল চালাইতেছেন। তাঁহারা প্রতিদিন রাশি রাশি সুতার নুটি প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদের কারখানাতে স্তূপাকার করিতেছেন। কিন্তু সেই সকল সুতার নুটি কোথায় বিক্রয় হইতেছে? কেন, য়ুরোপীয় বণিকগণ ওই সুতা ক্রয় করিয়া চিন, জাপান প্রভৃতি

দেশে গিয়া বিক্রয় করিয়া আসিতেছে। একজন সুতা প্রস্তুত করিল, দ্বিতীয় ব্যক্তি সেইগুলি লইয়া আর একজনের নিকট বিক্রয়া করিয়া লাভ করিয়া গেল। জাতিভেদ প্রথা থাকাতে প্রথমোক্ত ব্যক্তি সে লাভ করিতে পারিলেন না। এইজন্য ভারতীয়দের এত দারিদ্র্য।

এই প্রথা নিবন্ধন এই দেশের লোকের এত শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা। জাতিভেদপ্রথা নিবন্ধন আমাদের বিবাহ সম্বন্ধ ক্রমেই সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণতার সীমার মধ্যে বদ্ধ হইয়াছে, রক্তের বিমিশ্রণ হইতে পারে নাই। ইহা একটি প্রাণী জগতের পরীক্ষিত সত্য যে অল্পপরিসর ক্ষেত্রের মধ্যে যদি ক্রমাগত বিবাহ সম্বন্ধ ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে সে জাত ত্বরায় হীনতেজ হইয়া যায় এবং কালে উৎসন্ন দশা প্রাপ্ত হয়। দুইটি হাঁস পোষ, তাহাদিগকে এমনস্থানে লইয়া যাও যেখানে অন্য হাঁস নাই। এই দুইটি হাঁসের যে বংশ তাহাদের মধ্যেই বংশবৃদ্ধি চলুক, আর বাহিরের হাঁসও আনিও না। কয়েক পুরুষের মধ্যেই দেখিবে হাঁসগুলি দুর্বল, নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে, আরও কয়েকপুরুষ পরে দেখিবে তাহাদের বংশবৃদ্ধি বন্ধ হইয়া গেল। রক্তের বিমিশ্রণাভাবে যে শারীরিক দুর্বলতা তাহা বিজ্ঞানের প্রমাণিত সত্য। সুতরাং এবিষয়ে অধিক বলা নিরর্থক।

অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার : বিতর্কিত এবং বৈপ্লবিক

অর্থনীতিতে এ বছরের, অর্থাৎ ২০০৯-এর দু'জন নোবেল বিজয়ীই প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে গিয়ে বিতর্কিত হয়েছেন। এঁদের গবেষণার বিষয় হল বাজার ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা, ব্যর্থতা এবং অক্ষমতা। বাজারী ব্যবস্থার ব্যর্থতা থেকে ভাবনাচিন্তা শুরু করলে বহুলালিত বেশিরভাগ অর্থনৈতিক ধ্যানধারণা ভেঙে পড়তে বাধ্য।

এই দু'জন গবেষক—অলিভার উইলিয়ামসন এবং শ্রীমতি এলিনর অস্ট্রম। এদের বিষয় কয়েক যুগ পুরনো, কিন্তু কখনোই জনপ্রিয় হয়নি, মনে করছেন দিল্লির অর্থনীতিবিদ প্রদোষ নাথ। এলিনরের বিষয় হচ্ছে 'সর্বজনীন সম্পত্তি' বিষয়ক। যেমন পরিবেশ একটি সর্বজনীন সম্পত্তি। যেমন নদ-নদী-সমুদ্র। এক সময় গোচারণভূমি সর্বজনীন ছিল।

উইলিয়ামসনের বিষয় হচ্ছে সংস্থা-ভিত্তিক অর্থনীতি। চাই এমন সংগঠন, যেখানে বিভিন্ন মানব সম্পদের মধ্যে ক্রমাগত আদান-প্রদানের মাধ্যমে জ্ঞান-পরিধি পুষ্ট ও বিস্তৃত হবে। এবারের নোবেল পুরস্কারের বিশেষত্ব এটাই—বিষয়টি খুব জনপ্রিয় না হলেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মূল ধারার থেকে বিচ্ছিন্ন একটি বিষয় যা অর্থনীতিকে প্রভাবিত ও আমূল পরিবর্তিত করতে পারে।

বি শে ষ প্র ব ন্ধ

পলিটিক্যাল ম্যানেজমেন্ট

প্রবীর ঘোষ

গণতন্ত্রে যখন নির্বাচন-ই মুখ্য :

এখানে আমরা প্রথাগত গণতান্ত্রিক নির্বাচননির্ভর পলিটিক্যাল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আলোচনায় যাবো। যে রাষ্ট্রে শিল্পপতি ও বণিক শ্রেণি অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী, সেই দেশে বা রাষ্ট্রে তারাই একনায়কত্ব চালায়। অর্থাৎ শাসন চালায়। তাদের স্বার্থেই আইন তৈরি হয়। আইনগুলো এমনভাবে তৈরি হয় যাতে আইন মেনেই মসৃণভাবে শোষণ করতে পারে ধনী শিল্পপতি ও বণিকরা। যে দল সরকার গঠন করে, তাদের বলে শাসক দল। শাসক দলের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী দল সাধারণ ভাবে একটা বা বড়জোর দুটি রাজনৈতিক দল থাকে। শাসক দল ও তাদের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলো পরিচালিত হয় ধনীক শ্রেণির দ্বারাই। ধনীদের অর্থেই রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিকরা চলে। এই অর্থ সাহায্য আসে কখনও গোপনে, কখনও প্রচ্ছন্ন ভাবে, কখনও বা প্রকাশ্যে।

যে সমাজে ধনী ও গরীব, শোষক ও শোষিত দুটি শ্রেণিই অবস্থান করে সেই সমাজে 'গণতন্ত্র' সব সময়ই মেকি হতে বাধ্য।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র ও ভারতের গণতন্ত্র—দুই-ই মেকি। পার্থক্যটা ডিগ্রির। পরিমাপের। অর্থাৎ একজন দুধে জল মিশিয়েছে, আর একজন জলে দুধ—এই পার্থক্যের।

তথ্যগত ভাবে গণতন্ত্রে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে নাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত নাগরিকদের মধ্যে, সরকার কাজ করবে নাগরিকদের স্বার্থে। কিন্তু দেশের নাগরিকদের মধ্যে যদি সাম্য না থাকে, কিছু মানুষ যদি বহুকে শোষণ করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে তখন স্বাভাবিক ভাবেই একটা প্রশ্ন উঠে আসে—সরকার কার স্বার্থে কাজ করবে? কারণ গরীবের স্বার্থ দেখলে ধনীর স্বার্থ খর্বিত হয়। ধনীর স্বার্থ দেখলে গরীব বঞ্চিত হয়।

এমন 'নির্বাচন-সর্বস্ব' গণতন্ত্রই পৃথবীর সবচেয়ে বেশি দেশে চলছে। কারণ সেনা একনায়কত্বের চেয়ে ধনীক শ্রেণির একনায়কত্ব অনেকটা বেশি ভালো।

সবচেয়ে ভালো শাসন ব্যবস্থা হলো 'সাম্যের গণতন্ত্র' অর্থাৎ 'নব্য সমাজতন্ত্র'। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় ধস নামার পর সাম্যের

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে এগিয়ে এসেছে
'নব্য সমাজতন্ত্র' (Neo-Socialism)।

এই সমবায়ভিত্তিক গণতন্ত্রেরই প্রকাশ দেখা যাচ্ছে নেপালে, ভেনেজুয়েলায়, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, পেরু, চিলি, বলিভিয়া এবং এক-তৃতীয়াংশের বেশি ভারতের জেলায়।

আমরা এখন আলোচনা করবো নির্বাচন সর্বস্ব, নির্বাচনেই মোক্ষলাভের গণতন্ত্র—'বুর্জোয়া গণতন্ত্র' নিয়ে।

বুর্জোয়া গণতন্ত্রে পার্টিকে যা ঠিক করতে হবে :

(১) ধনীদের টাকা নিয়ে ভোট লড়তে হবে।

(২) গরীবদের ভোটে জিততে হবে।

এই দুটি সত্যকে প্রথমেই পরিষ্কার ভাবে মাথায় রাখতেই হবে। তবেই শাসন ক্ষমতা দখলের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সম্ভব। যথা—

(১) **'টার্গেট ভোটার' চিহ্নিত করতে হবে**। যেভাবে দৈনিক পত্রিকা বা নিউজ চ্যানেল ঠিক করে—সে কোন্ শ্রেণির পাঠক বা দর্শককে সন্তুষ্ট করবে। তাদের মে নর কথা বলবে। এ বিষয়ে মিডিয়াগুলো সাহায্য নেয় কোনও গবেষক সংস্থার উপর। সংস্থাটি দেখে, মিডিয়াটি বিশেষ রাজ্যভিত্তিক, নাকি সর্বভারতীয়। রাজ্যভিত্তিক হলে রাজ্যের খবরাখবর ও সমস্যাকে প্রাধান্য দিতে হবে। রাজ্য সরকার জনপ্রিয়তা হারালে রাজ্য সরকার বিরোধী মিডিয়ার পাঠক ও দর্শক বাড়ে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন, বাংলা, হিন্দি, উদু ভাষী পত্রিকায় যত গপ্পো, অলৌকিক কাহিনির ভিড় থাকে, ইংরেজি দৈনিকে তা থাকে না। কারণ ইংরেজি শিক্ষিতরা তুলনামূলক ভাবে কুসংস্কার থেকে বেশি মুক্ত। আপনি যদি ইংরেজি পত্রিকার প্রকাশক বা মালিক হন, আপনার টার্গেট পাঠকদের ধরতে আপনাকে নিরপেক্ষতার ভড়ং বজায় রাখতে হবে। এটা করতে হবে আপনার ব্যবসার স্বার্থে।

আপনার ভোটাররা যদি বেশি মাত্রায় প্রাদেশিক বা সাম্প্রদায়িক হয়, তবে সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দিয়ে সফল রাজনীতি করা যায়। এমনই সফল রাজনীতি করেছিল শিবসেনা। বাল থ্যাকারে মারাঠা প্রাদেশিকতা উস্কে দিয়ে বেশ কিছু বছর 'শিবসেনা' রাজ চালিয়ে গেছেন। বাল থ্যাকারের ভুলেই তাঁর দল আজ কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে। ভুলটা হল—সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জনতার মন বুঝে পার্টির প্রচার ও আদর্শকে পাল্টে ফেলতে না পারা।

মিডিয়ার লক্ষ্য ও আদর্শ যেমন মুনাফা, এইসব রাজনৈতিক দলগুলোর লক্ষ্য ও আদর্শ তেমনই গদি দখল।

শিবু সোরেন ঝাড়খন্ডের আদিবাসীদের নেতা। তাঁর নেতৃত্বে নির্বাচন নির্ভর আদিবাসীদের রাজনৈতিক দল 'ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা' গড়ে উঠেছে। এই মোর্চা আদিবাসীদের কিছুই দিতে পারেনি। কিন্তু আদিবাসীরা বন্ধু ভেবে শিবুকে দু-হাত ভরে দিয়েছে। ফলে ২০০৯-এর ডিসেম্বরে রাজ্য শাসনের ভার নিল মোর্চার নেতৃত্বে পাঁচ দলের জোট। মুখ্যমন্ত্রী হলেন শিবু সোরেন। পাঁচ দলের জোটে বিধায়ক সমর্থক সংখ্যা ৪৪, এদের মধ্যে ৩১ জনের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রয়েছে। নির্বাচিত মোট ৮১ জন বিধায়কের মধ্যে গ্রাজুয়েট ২ জন।

শিবুর আগেই ঝাড়খন্ডের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন মধু কোড়া। মাত্র ৮-৯ মাস গদিতে থেকে সরকারি তহবিল থেকে চুরি করেছিলেন কম করে ৪০০০ কোটি টাকা। ধরা পড়ে সোজা জেলে।

এইসব চোর-বাটপাড়-গুন্ডা-খুনি-অশিক্ষিতদের রাজনৈতিক দলগুলোর ঝাড়খন্ডে টার্গেট ভোটার সহজ-সরল আদিবাসীরা। ঝাড়খন্ড রাজ্য তৈরি হয়েছে মাত্র ৯ বছর আগে ইতিমধ্যে ২০০৯-এ শিবু সোরেন সপ্তম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন। ভাবা যায়! ওইটুকুন রাজ্যে আদিবাসী ভোটারদের টার্গেট করেছে কংগ্রেস, বিজেপি এবং দু-গন্ডার বেশি আদিবাসীদের রাজনৈতিক দল। সবারই উদ্দেশ্য যেন-তেন-প্রকারেণ গদি দখল। যত কম সময়ের জন্যই হোক না কেন, গদি চাই। ভোটারদের মন ভেজাতে সব পার্টি আদিবাসী উন্নয়নের মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছে।

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) (সিপিআইএম)-এর জন্ম ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। দেশ ভাগের ফলে উদ্বাস্তু আগমন ঘটে পশ্চিমবঙ্গে। তাদের পাশে দাঁড়ায় পার্টি। ভূমিসংস্কারের মধ্য দিয়ে কৃষকদের মন জয় করে। গরীব কৃষক-শ্রমিক-উদ্বাস্তু ও সংখ্যালঘুদের 'টার্গেট ভোটার' করে প্রথমদিকে ভালই গুছিয়ে নিয়েছিল। তারপর টার্গেট ভুলে ক্যাডার ও পুলিশ দিয়ে ভোটারদের চমকে ক্ষমতায় থাকতে গিয়ে ভুল করলো। টার্গেট ভোটাররাই বিগড়ে গেলেন। কর্মস্থল প্রধানত পশ্চিমবঙ্গ। ত্রিপুরা ও কেরলেও কর্মক্ষেত্র। নেতা— প্রকাশ কারাত ও সীতারাম ইয়েচুরি।

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই) প্রোগ্রাম বলছে—তাদের লক্ষ্য সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা। কিন্তু কাজের বেলায় কংগ্রেস ও সিপিআইএম-এর লেজুড়বৃত্তির কৌশল নিয়েই চালিয়ে গেল। টার্গেট ভোটার নেই। ফলে লেজুড়বৃত্তির জন্য যা সামান্য সিট্ জোটে, তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়, কর্মক্ষেত্র পশ্চিমবঙ্গ।

অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের জন্ম ১৯৯৮ সালে। অখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি (আই) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই দলের জন্ম। কর্মক্ষেত্র প্রধানত পশ্চিমবঙ্গে।

'টার্গেট ভোটার' সিপিএম ও বামফ্রন্টের সন্ত্রাসের শিকার মানুষরা। ওইসব অত্যাচারিত মানুষদের পাশে বার-বার দৌড়ে গেছেন তৃণমূলের চেয়ারম্যান মমতা ব্যানার্জি। ফলে দুরন্ত সাফল্য ধরা দিয়েছে।

অখিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কমিটি (আই)। জন্ম ১৯৭৮ সালে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে নিজের নামে (আই = ইন্দিরা) দলটি তৈরি করেন। টার্গেট ভোটার বলতে সর্বভারতীয় দল হিসেবে স্থায়ী সরকার চায় এমন মানুষ 'গরীবী হাটাও' স্লোগানে বিশ্বাসী গরীব এবং মুসলিম ভোটার। প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দল যেহেতু ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এবং তারা উগ্র হিন্দুত্ববাদী, তাই মুসলিম ভোটারকে টার্গেট করাটা কংগ্রেসের কাছে জরুরি। এরই পাশাপাশি বিভিন্ন আঞ্চলিক দলের সঙ্গে আসন সমঝোতা করছে গদীর স্বার্থে, নীতির স্বার্থে নয়। নেতা— সোনিয়া গান্ধী।

ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। ১৯৮০ সালে জনতা পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিজেপি-র জন্ম। কংগ্রেস (আই)-এর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। উগ্র হিন্দুত্ববাদী ও উচ্চবর্ণের পার্টি। তাদের 'টার্গেট ভোটার' মনে-প্রাণে হিন্দু ও উচ্চবর্ণের মানুষ। আঞ্চলিক দলের সঙ্গে আসন সমঝোতা করে ক্ষমতা দখলের স্বার্থে।

রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)। জনতা দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ১৯৯৭ সালে জন্ম। ডিক্টেটর নেতা লালুপ্রসাদ যাদব। 'টার্গেট ভোটার' যাদব, ওবিসি সম্প্রদায় ভুক্তরা এবং ভূস্বামীরা কর্মস্থল বিহার।

সমাজবাদী পার্টি। জনতা পার্টি ও জনতা দল (এস) মিলে পার্টিটির জন্ম। প্রধান নেতা মুলায়ম সিং যাদব ও অমর সিং। 'টার্গেট ভোটার' মুসলমান। কর্মক্ষেত্র উত্তরপ্রদেশ।

সর্বভারতীয় আন্না দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজগম্ (এআইডিএমকে)। ডিএমকে ভেঙে দলটি গড়ে ওঠে ১৯৭২ সালে। তামিলদের জন্য স্বশাসন এবং বেশি স্বাধীনতা চায় আমেরিকার স্টেটগুলোর মতো। ওদের 'টার্গেট ভোটার' আবেগপ্রবণ স্বল্পশিক্ষিত বা শিক্ষার সুযোগ না পাওয়া তামিলরা। পার্টির প্রধান নেতা জয়ললিতা জয়রাম। দুর্নীতির জন্য প্রধান নেতা থেকে দলের অন্যান্য নেতারা কুখ্যাত। কর্মক্ষেত্র তামিলনাড়ু। ডিগবাজিতে ওস্তাদ পার্টি।

দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজগম (ডিএমকে)। ১৯৪৯ জন্ম। উগ্র দ্রাবিড় জাতিয়তাবাদী দল। 'টার্গেট ভোটার' তামিল জাত্যাভিমানের আবেগে ভেসে যাওয়া স্বল্প শিক্ষিত

ও শিক্ষার সুযোগ না পাওয়া তামিলনাড়ুর মানুষ। নেতা : এম করুণানিধি। দুর্নীতিতে এআইডিএমকে-র সঙ্গে পাল্লা দেওয়া পার্টি। ঘন-ঘন জোটসঙ্গী পাল্টায়।

বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)। 'টার্গেট ভোটার' উত্তরপ্রদেশের দলিত ও অস্পৃশ্য মানুষ। জোটসঙ্গী হিসেবে কখন কার হাত ধরবে, কখন ছাড়বে—বোঝা মুশকিল। নেতা— মায়াবতী। দুর্নীতির জন্য পার্টির বহু নেতারাই কুখ্যাত।

তেলেগু দেশম। ১৯৮২-তে স্থাপিত। ১৯৯৫-তে দল দু-ভাগ হয়। প্রধান দল 'তেলেগু দেশম (নাইডু)'। অন্ধ্রপ্রদেশের গ্রামাঞ্চলের গরীবরা এই পার্টির 'টার্গেট ভোটার'। নেতা— চন্দ্রবাবু নাইডু। নাইডুকে তুলেছিলেন গরীর তেলুগুভাষীরা। নাইডুর বড়লোক চাটা নীতি তাঁকে গদী থেকে নামিয়ে আনে।

অকালি দল। এটি শিখ সম্প্রদায়ের মানুষদের নিয়ে তৈরি দল। দলের দাবি—স্বায়ত্ত্বশাসন ও 'খালিস্তান' নামের ভিন্ন রাজ্য গঠন। 'টার্গেট ভোটার' শিখ উগ্রবাদী ও শিখ জাতিয়তাবাদী। নেতা— প্রকাশ সিং বাদল।

(২) **প্রচার।** নির্বাচন নির্ভর রাজনৈতিক দলের কাছে প্রচার অবশ্যই একটা অন্যতম প্রধান যুদ্ধাস্ত্র। প্রচার বিষয়টাকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রচার নানা ভাবে করা যেতে পারে। পোস্টার ছেপে বা লিখে। লিফলেট ছেপে। দেওয়াল লিখনের সাহায্যে, ব্যানার টাঙিয়ে, হোর্ডিং করে। টিভি'তে ও সিনেমায় বিজ্ঞাপন দিয়ে। পুজো প্যান্ডেল-মেলা-নাট্যোৎসবে বিজ্ঞাপন দিয়ে, পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে নিজের পার্টির প্রচার চালান যায়। এর অনেকগুলো পদ্ধতি একই সঙ্গে প্রয়োগ করে দেখতে পারেন। আপনার ভোটাররা যদি হাই-ফাই হন, আপনি ইন্টারনেটেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

বিজ্ঞাপন লেখার জন্য বহু সংস্থা আছে। তাদের হাতে বিজ্ঞাপন তৈরি, এমনকি প্রচারের দায়িত্ব তুলে দিতে পারেন।

অনেক সাংবাদিক ও মিডিয়া আপনার পার্টির কথা প্রচারে তুলে আনবে। বিনিময়ে মোটা টাকা দিতে হবে। মিডিয়ার খবর হিসেবে প্রচার পাওয়ার মূল্যই আলাদা।

প্রচারে মিছিল, ট্যাবলো, সভা, নাটক, পথ নাটিকা মিটিতে শর্ট ফিল্ম, সবই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নির্বাচনের সময় গাড়ির মিছিল, মোটরবাইকের মিছিল, ছৌ মিছিল, রণ পা মিছিল, ঢাক-তাসা বাজিয়ে মিছিল সবই কম বেশি প্রচারের জন্য ব্যবহৃত হয়।

আপনাকেই প্রত্যেকটি প্রচারের আলাদা আলাদা করে 'ফিডব্যাক' নিয়ে দেখতে

হবে ভোটাররা কোন প্রচার কীভাবে নিচ্ছেন। এই বিষয়েও উপযুক্ত পেশাদার সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

'ফিডব্যাক' রিপোর্ট পাওয়ার পর সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন, কোন কোন মিডিয়াকে কী পরমান টাকার বিজ্ঞাপন দেবেন। কোন কোন বিজ্ঞাপন খাতে খরচ কমাবেন, কোন খাতে খরচ বাড়াবেন।

(৩) **ক্যাচি স্লোগান তৈরি করুন।** প্রোডাক্টের যেমন ব্র্যান্ডিং-এর দরকার হয়, তেমনই নির্বাচনে সাড়া ফেলতে জোরালো স্লোগানের প্রয়োজন।

যখনই দেশ গভীর সমস্যায় পড়ে, তখনই সমস্যা থেকে দেশবাসীদের দৃষ্টি ঘোরাতে পাশের দেশের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধাতে হয়। এমনই একটা সময়ে কংগ্রেস স্লোগান তুলেছিল 'জয় জওয়ান, জয় কিষান'। জওয়ানদের পক্ষে জানিয়ে তোলা আবেগকে এবং কিষাণদের আবেগকে সুড়সুড়ি দেওয়ার পক্ষে খুবই কার্যকর হয়েছিল কংগ্রেসের এই স্লোগান। এবিষয়ে সাহায্য নিয়েছিল সাংবাদিক ও মিডিয়ার।

এমনই কয়েকটা জনপ্রিয় স্লোগান হল, 'মেরা ভারত মহান', 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে', 'ডু ইট নাউ', 'কথা কম, কাজ বেশি', 'কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ', 'জয় হো', 'আমরা মেহনতি মানুষের পক্ষে', 'এক দেশ, এক আইন', 'ইন্ডিয়া ইজ শাইনিং'। এইসব স্লোগান বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সময় তৈরি করেছিল জনচিত্তকে দুলিয়ে দিতে।

'মা-মাট-মানুষ' তেমন কোনও জোরালো স্লোগান নয়। বরং পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে বিরোধীদের স্লোগান হতে পারতো—'বাংলা বাঁচাও, ভয়-ভুখ-ভ্রষ্টাচার হাটাও'।

(৪) **ফাণ্ড তোলা।** নির্বাচনে লড়া মানেই বিশাল খরচের ব্যাপার। এর জন্য বড় অর্থভান্ডার গড়ে তোলা দরকার। তার জন্য বড় বড় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী তখনই ১০০ টাকা দেবে, যখন বিনিময়ে ৫০০ টাকা মুনাফা তুলতে পারবে।

ব্যবসায়ীদের বোঝাতে হবে নির্বাচনে আপনার পার্টির কিছু আসন জেতার প্রচুর সম্ভরবনা রয়েছে। জয়ী বিধায়ক ও সাংসদরা বিধানসভায় ও লোকসভায় আপনার স্বার্থে কাজ করবে। গোটা কয়েক আসন পেলে আর কোনও পার্টি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে শাসক দলের অংশিদার হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। তখন তো আপনারাই ব-কলমে শাসন চালাবেন।

বোঝান ও যতটা পারেন চাঁদা আদায় করুন। এইসব চাঁদা আদায় হয় কালো টাকায়। সুতরাং রসিদ দেওয়ার ও হিসেব রাখার বালাই থাকে না। অতএব পার্টির যে সব নেতা যত টাকা আদায় করবে, তার একটা অংশ ব্যক্তিগত আয় হিসেবে রেখে দেবেই। এতে কোনও নির্বাচন নির্ভর রাজনৈতিক দল অনৈতিক কিছু দেখে না।

পার্টি আরও বড় হলে আরও বড় ফান্ডের প্রয়োজন হয়। পার্টি বড় হলে বড় বড় শিল্পপতিরাই পার্টির নেতাদের পিছনে ঘুরবে কাজ গোছাতে। কারও পিছনে টাকার থলি নিয়ে এসে দাঁড়াবে বস্ত্র উৎপাদকরা, তো কারও পাশে চিনি উৎপাদনকারীরা। কোনও পার্টির পিছনে গম উৎপাদক বৃহৎ কৃষক সম্প্রদায়, তো কোনও পার্টি ভোজ্য তেল উৎপাদনকারীদের 'লবি' (lobby) হিসেবে কাজ করে। কোনও পার্টির পিছনে অনিল আম্বানী, তো কোনও পার্টির পিছনে মুকেশ আম্বানী টাকা নিয়ে ঘুরছেন।

বিনা পয়সায় মোটর কারখানার জন্য জমি দিলে সেও যে পার্টি ফান্ডে ও ব্যক্তি ফান্ডে মোটা টাকা দেবে—তা অভ্রান্ত সত্য। বর্ডারে যারা মালপাচার করছে, প্রোমোটিং করছে, জমি কিনছে, বাড়ি কিনছে, কারখানা করছে—তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে তোলা আদায় করাটাই এখনকার নির্বাচন নির্ভর রাজনৈতিক দলগুলোর দস্তুর। যার যতটা শক্তি সে ততটাই ভাণ্ড বাড়াতে পারে।

মনে রাখবেন—ফাণ্ড নেই, তো ইলেকশনে নেই।

(৫) **তণমূল স্তরে সংগঠনকে নিয়ে যান।** নির্বাচনে জিততে গেলে শুধুমাত্র সরকার বিরোধী ঝড় বা সুনামির উপর নির্ভর ভুল হবে। এই বিরোধী আবেগ একদিন মিলিয়ে যেতে বাধ্য। যে যে এলাকায় পার্টির শক্তি বেশি বা মোটামুটি, সেই সেই এলাকায় বুথ ভিত্তিক কর্মীবাহিনী তৈরি করতে হবে।

কর্মীবাহিনী কীভাবে করবেন—সেটা পার্টির সমস্যা। সিপিআইএম যেমন কর্মী ও সমর্থকদের চাকরি দিচ্ছে, হুকিং করে বিদ্যুৎ টানতে দিচ্ছে, ফুটপাথ বা রাস্তা দখল করে দোকান চালাতে দিচ্ছে, সাট্টার ঠেক চালাতে দিচ্ছে, বেআইনি অটো চালাতে দিচ্ছে এবং বিনিময়ে তাদের ক্যাডার হতে বাধ্য করছে। ক্যাডারদের দিয়ে প্রতিটি বুথ এলাকার প্রতিটি বাড়ির সব খবর নিচ্ছে। প্রয়োজনে—অপ্রয়োজনে পারিবারিক বিষয়েও নাক গলাচ্ছে। নাগরিকদের বুঝিয়ে দিচ্ছে—আমরাই শেষ কথা, থানা-আদালত নয়।

এই কারণেই সিপিআইএম রেকর্ড বছর রাজত্ব করে চলেছে। আবার এই কারণেই একদন ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে যাবে।

বিজেপি অনেক আদিবাসী এলাকাতেই বুথ ভিত্তিক ভাবে বহু কর্মীকে দিয়ে স্কুল চালাচ্ছে, কর্মশিক্ষার ক্লাস করাচ্ছে, প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র চালাচ্ছে। আদিবাসীদের মনও জয় করছে ঝাড়খন্ড, ছত্তিশগড় থেকে গুজরাট পর্যন্ত বহু প্রদেশেই। ওদের কর্মীরা শ্রম দেন আদর্শের তাগিদে।

পথ আপনিই ঠিক করবেন। অথবা নেবেন নতুন পথ।

(৬) **দরদি ইমেজ তৈরি করুন।** কখনও গরীব দরদি, কখনও হিন্দু দরদি, কখনও মুসলিম দরদি, কখনও বাঙালি দরদি তো কখনও তেলেগু দরদি, কখনও নারী দরদ তো কখনও বেশ্যা দরদি ইত্যাদি দরদ ইমেজই আপনার ভোটবাক্স ভরিয়ে

দেবে। দরদি মুখোশটা পরে ফেলুন যখন যেমন প্রয়োজন। ফল ভালোই পাবেন।

খ্যামটা নাচতে গিয়ে যেমন ঘোমটা টানতে নেই, তেমনই বুর্জোয়া গণতন্ত্রে নির্বাচন জিততে মুখোশহীন থাকতে নেই।

(৭) **গুন্ডা-সমাজবিরোধী-খুনে রাখতে হবে দল বাড়াবার স্বার্থে।** মুখে বলুন, ‘‘আমাদের দলে দুর্নীতিবাজদের কোনও স্থান নেই।’’ কাজের বেলায় দেখবেন, দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজবিরোধীদের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এ’দেশের নির্বাচনে কোনও পাত্তা পাবেন না। সুতরাং বুর্জোয়া গণতন্ত্রে আপনাকে ও’পথেই হাঁটতে হবে।

এলাকা দখল করতে, ভোটারদের চমকাতে, বুথ দখল করতে গুন্ডা-খুনেরাই সহায়ক শক্তি। প্রতিদ্বন্দ্বী পার্টির সন্ত্রাস রুখতেও অস্ত্র লাগে। অস্ত্র কেনা, চালাতে জানা মানুষদের দয়ে ক্যাডারদের অস্ত্র চালানো শেখানো-এর কোনও বিকল্প এখনও এ’দেশে তৈরি হয়নি।

(৮) **বিভিন্ন শ্রেণি থেকে বিখ্যাতদের কাছে টানুন।** সাহিত্য-নাটক-পেইন্টিং-সিনেমা-খেলা-গান-নাচ-আবৃত্ত ইত্যাদি বহু বিষয়ের বিখ্যাতদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তাঁদের কাছে টানুন। আপনার দলের পক্ষে ওঁরা কথা বলুন, পথ হাঁটুন। আপনার দল জনগণের মধ্যে সাড়া ফেলবেই।

এই পদ্ধতিতে এক সময় ‘বুদ্ধজীবী’দের কাছে পেয়েছিল সিপিআইএম। এখন ‘বুদ্ধিজীবীরা’ তৃণমূলের পাশে।

আবার একই সঙ্গে এও সত্যি যে, আপনি যতই ক্ষমতার কাছাকাছি আসবেন, ততই মধুর লোভে অনেক বুদ্ধিজীবীই শিবির পাল্টাবেন।

এ’সবই মাথায় রেখে বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ান, যদি দল বাড়াতে চান।

(৯) আরও কিছু সমমনোভাবাপন্ন দল অথবা আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী দলের শত্রু দলের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন।

মনে রাখবেন, রাজনীতিতে কোনও স্থায়ী বন্ধু হয় না। স্থায়ী হয় কেবল স্বার্থ।

(১০) সাধারণ মানুষেণ সঙ্গে ভালো ব্যবহার করুন। তাঁদের বিপদে-আপদে প্রয়োজনে তাঁদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। টাকার অভাবে মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, কলেজে ভর্ত হতে পারছে না, চিকিৎসা হচ্ছে না—টাকা দিন উদার হাতে। পার্টির নেতার এমন হৃদয়বান ইমেজ তৈরি করতে শ্রমের টাকা খরচ করতে হয় না। লোটা টাকার কিছুটা খরচ করুন—দেখবেন আপনি গরীবদের দেবতা হয়ে গেছেন।

(১১) প্রশাসনের ও পুলিশের উঁচু পদাধকারীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলুন। ওরা হলেন, ‘‘ফেল কড়ি, মাখ তেল, কেউ কী আমার পর’’—নীতিতে বিশ্বাসী।

(১২) প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে গুপ্তচর ঢোকান, অথবা প্রতিদ্বন্দ্বী দলের কয়েকজন নেতাকে কিনে ফেলুন। দাম উঠে বেশি...প্রমিস।

পরমাণু বিদ্যুৎ : দুনিয়া এগোচ্ছে, আমরা সেই তিমিরে

বিকাশ সিংহ

মেদিনীপুরে, সাগরের ধারের একটি গ্রাম, নাম হরিপুর। অনেক দিন ধরে জল্পনাকল্পনা চলছে যে, এখানে পরমাণু চুল্লি বসবে। পরমাণু চুল্লির জন্য নদীর জল কিংবা সমুদ্রের জল নিতান্তই প্রয়োজন। যেমন, চেন্নাইয়ের কাছে কলপাক্কমে দেখা যায়। এই প্রেক্ষিতেই হরিপুরের মতো স্থান নির্বাচন। কিন্তু পরমাণু বিদ্যুতের প্রতি পশ্চিমবঙ্গ বিমুখ। যেমন সরকার, তেমনই সাধারণ মানুষ—দু'পক্ষই পরমাণু চুল্লির বিরোধী। যেহেতু হিরোসিমা-নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা ফাটিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সেহেতু পরমাণু চুল্লি সংক্রান্ত যে কোনও কাজ খারাপ। চুল্লি থেকে তেজস্ক্রিয় প্লুটোনিয়াম তৈরি হবে এবং তা দিয়ে বোমা তৈরি হবে, এটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কিছুতেই মেনে নেবে না। অথচ, নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশনের সেফটি রেকর্ড বলছে, পরমাণু শক্তি কোয়ালিটির দিক থেকে 'the cleanest of all'.

পশ্চিমবঙ্গ কোনও ভাল কাজই মানতে রাজ হয় না। সে সিঙ্গুরে মোটরগাড়ির কারখানাই হোক বা হরিপুরের পরমাণু চুল্লিই হোক। যেমনটি আছি, তেমনটিই থাকব—এই আমাদের পছন্দ, এই আমাদের মোদ্দা কথা। বেশ কিছু দিন আগে পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা জোর গলায় বলতে লাগলেন, প্রচার করতে লাগলেন যে, পরমাণু চুল্লি হলে পরিবেশ দূষিত হবে, চুল্লি থেকে নিঃসৃত তেজস্ক্রিয়তা বা রেডিওঅ্যাকটিভিটি মানবসভ্যতা ধ্বংস করে ছাড়বে। উর্বর জমি ছিনিয়ে নিলে চাষিভায়ারা না খেতে পেয়ে মারা পড়বে, মাঝিভায়া মাছ ধরে আর জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। ইদানীং কালে পৃথিবীর আবহাওয়ার যে অস্বাভাবিক পরিবর্তন চোখে পড়ে, যেখানে অতিরিক্ত কার্বন মনোঅক্সাইড আর ডাইঅক্সাইডের অনুমেয় পরিমাণ আগামী প্রজন্মকে সত্যিই বিপদে ফেলবে, সেখানে এ বার ভেবে দেখতেই হবে আর কত দিন এই নতুন প্রজন্মের পরমাণু চুল্লিকে মানব-সভ্যতা ঠেলে সরিয়ে রাখতে পারবে। কেবলমাত্র পরমাণু চুল্লি দিয়ে পৃথিবীব্যাপী বিশাল শক্তির চাহিদা কিছুতেই মেটানো যাবে না। কিন্তু, পরমাণু শক্তির বিকল্প ভেবে আর বোধ হয় লাভ নেই। বিজ্ঞানী হিসেবে জড়িত থাকার কারণে জোরের সঙ্গেই বলতে পারি যে, পরমাণু চুল্লি থেকে বিষাক্ত

গ্যাস বেরনো একেবারেই অসম্ভব। বস্তুত, অনেক তর্ক-বিতর্কের পরে সারা পৃথিবীতে পরমাণু চুল্লির নবজাগরণ বা নিউক্লিয়ার রেনেসাঁস দেখা যাচ্ছে। আমাদের নাতিপুতিদের জন্য যে পৃথিবী অপেক্ষা করছে, সেখানে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ হবে অনেক বেশি। আর গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর কথা না হয় না-ই তুললাম। তা হলে আগামী দিনে পৃথিবীর মানুষের শক্তির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পরমাণু শক্তির বিকল্প নেই।

ভারতের পরমাণু শক্তি পরিকল্পনার প্রাণপুরুষ হোমি ভাবা তাঁর বৈজ্ঞানিক দূরদর্শিতা এবং জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুযোগে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে তৈরি করেন পরমাণু শক্তির রূপরেখা। প্রথমে তৈরি হয় অ্যাটমিক এনার্জি ট্রম্বে এস্টাবলিশমেন্ট, পরে যা ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার নামে পরিচিত হয়। প্রথম পরমাণু চুল্লি 'অপ্সরা' (১৯৫০) থেকে শুরু করে ভারতের পরমাণু শক্তি দফতর এখন চুল্লি প্রযুক্তিতে সম্পূর্ণ স্বনির্ভর। পঞ্চাশের দশকে যখন অপ্সরা 'ক্রিটিকাল' হল, তখন ভাবা সাহেব তাঁর ভাইকে (জওহরলালকে 'মাই ডিয়ার ভাই' বলে সম্বোধন করতেন তিনি) টেলিফোন করে খবর দেন, প্রধানমন্ত্রী তখন লোকসভায়। সভার মাঝখানে প্রধানমন্ত্রী টেলিফোন ধরলে তিনি বলেন, 'ভাই, অপ্সরা ক্রিটিকাল হল।' পণ্ডিতজিও বুঝে যান যে, মুহূর্তটি ঐতিহাসিক।

পশ্চিম ভারতে তারাপুর, উত্তর ভারতে কাইগা, দক্ষিণে কলপাক্কম, কুডাঙ্কুলম এবং আরও ক'টি পরমাণু চুল্লি স্থাপিত হয়েছে বেশ কিছু দিন হল। হালে রাজস্থানে রানা প্রতাপ হ্রদের পাশে RAPP (1-6) পরমাণু চুল্লি দেখে আমার তাক লেগে গেল। কী নেই! আশেপাশে স্কুল, কলেজ, বাড়িঘর, কোয়ার্টার্স, হাসপাতাল। কিছু দিন আগে সদ্য প্রাক্তন হওয়া অ্যাটমিক এনার্জির প্রধান, অনিল কাকোডকর-এর সঙ্গে একটা ডেলিগেশনে গিয়েছিলাম ইংল্যান্ডে। লন্ডনে রয়াল ইনস্টিটিউট অব এনজিনিয়ার্স-এর বক্তৃতার সময় বুঝলাম, ভারতের পরমাণু শক্তি সংক্রান্ত গবেষণা ও প্রযুক্তির প্রতি ইংরেজদের কতখানি আগ্রহ। ইংরেজরা অন্য কোনও দেশের গুণগান করতে কতখানি দ্বিধাগ্রস্ত, সে কথা নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না।

এ বার আসা যাক পশ্চিমবঙ্গে। 'ওঁরা' চিরকালই বলে এসেছেন, পরমাণু চুল্লি মানেই মানব-সভ্যতার শেষ। পরমাণু চুল্লি মানে যে পরমাণু বোমা বানানোর কারখানা নয়, এ সত্য 'ওঁরা' আর কবে বুঝবেন? গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর মারাত্মক বিপদ, কার্বন ডাইঅক্সাইডের দয়ায় পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে চলেছে, 'ফসিল ফুয়েল' অর্থাৎ কয়লা বা পেট্রোলিয়ম জ্বালানোর ফলে হিমালয়ের গ্লেসিয়ার গলছে বলে বঙ্গোপসাগরে জলের মাত্রা বেড়ে চলেছে। হবি তো হ, দেশের কয়লাখনিগুলো আবার পশ্চিমবঙ্গেরই আশেপাশে। আপনারা জানেন বোধ হয়, পশ্চিমবঙ্গের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে যে কয়লা পোড়ানো হয়, তাতে ছাইয়ের অনুপাত বেশি।

ভারতের রেল দফতর এই ছাইভর্তি কয়লার বোঝা মহারাষ্ট্র বা ভারতের অন্যান্য জায়গায় নিয়ে যেতে নারাজ কাজেই পশ্চিমবঙ্গের এই নিচু মানের কয়লা জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে চুল্লিগুলি ক্রমাগত একের পর এক বন্ধ হয়ে চলেছে।

পরমাণু চুল্লি থেকে পরিবেশের কোনও ক্ষতি হয় না। সারা ভারতের যদি, আমার ভাষায়, Nuclear Arc (আণবিক জ্যা) লক্ষ করেন, দেখবেন এটি পশ্চিমের রাজস্থান থেকে শুরু হয়ে দক্ষিণ ভারতের নতুন MAPP চুল্লিগুলোতেই আটকে রয়েছে। এই সব জায়গায় আরও চুল্লি বসবে। এই আর্কটি আর একটু উঠে এলে ক্ষতি কী? আর এটা না হলে ফসিল জ্বালানির দূষণ থেকে বাঁচার রাস্তাই বা কোথায়? ২০২০-র মধ্যে ২০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমাদের লক্ষ্য, এবং এ ব্যাপারে ভারত এখন বদ্ধপরিকর।

ফিরে আসি হরিপুরে। বঙ্গোপসাগরের ধারে। পরিকল্পনাটি কী? ছ'টি ১,০০০ মেগাওয়াটের পরমাণু চুল্লি তৈরি করা হবে রাশিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে। ভারতের ওয়ার্কহর্স এত দিন পর্যন্ত ছিল মোটামুটি ভাবে ২৫০ মেগাওয়াট, Pressurised Heavy Water Reactor, RAPP (1-6), Tarapur MAPP, চেন্নাই এবং অন্যান্য জায়গায়। তার পর দেখা গেল, একসঙ্গে অনেকগুলি চুল্লি বানালে সময় ও অর্থ, দু'দিক থেকেই সুবিধে। ভারতের দক্ষিণে একেবারে শেষপ্রান্তে কুডাঙ্কুলম বলে একটি অসম্ভব সুন্দর জায়গায়, রাশিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে, সেখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে, আলোচনা করেই তৈরি হচ্ছে দুটি ১,০০ মেগাওয়াটের পরমাণু চুল্লি। হরিপুরের চুল্লিগুলি তৈরি হবে অবিকল কুডাঙ্কুলমের ধাঁচে। এ দিকে, বুদ্ধিজীবী ও পরিবেশ রক্ষার ঠিকাদারগণ বলে বেড়াচ্ছেন পরমাণু চুল্লির 'ধোঁয়া'-য় পরিবেশ দূষিত হবে। চাষিদের কাছ থেকে নাকি জোর করে জমি নেওয়া হচ্ছে। তাঁরা ধরেই নিয়েছেন, এখানে আর একটি নন্দীগ্রাম কিংবা সিঙ্গুর হবে। ভারতের অন্যত্র কী হচ্ছে, তা নিয়ে ওঁরা মাথা ঘামাতে চান না। ওঁরা জানেন না অথবা জানলেও না জানার ভান করেন যে স্থানীয় মানুষের সম্মতি ছাড়া পরমাণু চুল্লি বসানোর কোনও প্রশ্নই নেই।

এ বারে বিজ্ঞান ও বাস্তবে আসা যাক। প্রথমত, যেখানে নিউক্লিয়ার পার্ক, মানে ছটা চুল্লি বসবে, সেটা নোনা জলের পতিত জমি। হ্যাঁ, মৎস্যচাষিদের নৌকাগুলি সেখানে থাকে। 'ওঁরা' মৎস্যজীবীদের বুঝিয়েছেন আর মাছ ধরা যাবে না, জীবিকা যাবে এবং কেউ কেউ এও বুঝিয়েছেন যে, মাছগুলিও রেডিওঅ্যাকটিভ হয়ে যাবে! এ তো প্রায় পাগলের প্রলাপ। আমি জানি, কলপক্কমের মাছ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে থাকে বলে খেতেও বেশ সুস্বাদু। নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশন হরিপুরের মৎস্যজীবীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল কলপক্কমের মৎস্যজীবীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা, স্কুল, হাসপাতাল দেখে আসতে। হরিপুরের মানুষকে নিয়েই,

তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেই সমস্ত কাজ হবে। তাঁরা হবেন সমমর্যাদাসম্পন্ন সহযোগী—ইকোয়াল পার্টনার। তাঁদের জীবিকা ও মঙ্গল আমাদের কর্তব্যের তালিকায় প্রথম। সব কিছু ঠিক ভাবে এগোলে আগামী পাঁচ-ছয় বছরে দুটি ১,০০০ মেগাওয়াটের চুল্লি বসানো যাবে। পশ্চিমবঙ্গে এত বড় মাপের শিল্প এলে অন্তত ৫০০০ থেকে ৭,০০০ কর্মসংস্থান হবে। দশ বছর বাদে ৬,০০০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ পশ্চিমবঙ্গের শিল্প উন্নয়নে দারুণ কাজে লাগবে। অন্য দেশের দিকে যদি না-ও তাকাই, আমারই দেশের অন্য রাজ্যের দিকে তাকাতে ক্ষতি কী?

—৫ জানুয়ারি ২০১০, আনন্দবাজার পত্রিকা

এই প্রথম ভারতে এক ভারতীয়ের জেনেটিক কোডের বর্ণবিন্যাস নির্ধারিত হলো

আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানমহলে মানুষের শরীরের সমস্ত 'জিন'-এর হিসাব মেলে নয় বছর আগে। মোট ৩.৩ বিলিয়ন, অর্থাৎ তিনশো কোটির উপর জেনেটিক অ্যালফাবেট (জিন-এর সংখ্যা বা বর্ণ দিয়ে দেওয়া নাম সহ তাদের অবস্থান ও কাজকর্মের হিসাব) থাকে একজন মানুষের শরীরে। সারা পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত মাত্র ১৫ জন মানুষের সমস্ত জিন এইভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের নাম অবশ্য গোপন রাখা হয়েছে। শুধু দু'জনের নাম আমরা জানি যাঁদের একজন—জেমস্ ওয়াটসন, যিনি নিজেই DNA এর গঠন আবিষ্কার করেন, আরেকজন ক্রেগ ডেন্টার নামে এক জীববিজ্ঞানী।

এই জিনের ধাঁধার সমাধান করলে আমরা যেমন আমাদের বংশগতি এবং সম্ভাব্য পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে জানতে পারি, তেমনি আমাদের শরীরে অসুখের প্রবণতার বিষয়েও আগাম জানতে পারি।

এই প্রথম ভারতে 'ইনস্টিটিউট অফ জিনোমিক্স্ অ্যান্ড ইন্টিগ্রেটেড বায়োলজি' সংস্থার গবেষকরা একজন ৫২ বছর বয়সী ঝাড়খন্ডের নাগরিকের জেনেটিক কোড নির্ধারণ করেছেন। সময় লেগেছে মাত্র দশ সপ্তাহ, খরচ হয়েছে ৩০,০০০ ডলার। প্রসঙ্গত, প্রথমটির বেলায় সময় লেগেছিল প্রায় দশ বছর আর খরচ হয়েছিল তিনশো কোটি ডলার।

শিগগিরই খরচ আরও কমবে আর আরও বেশি মানুষ তাদের জিনগত শারীরিক গঠন ও প্রবণতার সম্পর্কে জানতে বুঝতে পারবেন, এমনটাই অনুমান করছেন বিজ্ঞানীরা। এতে চিকিৎসাবিজ্ঞানে একটা বিপ্লব ঘটতে চলেছে।

(দ্য টেলিগ্রাফ ৯ ডিসেম্বর, ২০০৯)

একদিন ট্রেনে

মৃণাল কয়াল

একদিন অফিস টিফিনে ছুটি হয়ে যায়। আমি গভ্‌মেন্ট আর্ট কলেজে কাজ করি। সেদিন আমি হাঁটতে হাঁটতে, মানুষ-দোকানপাট দেখতে দেখতে শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছলাম। ডায়মন্ড হারবার লোকাল ধরব। কিন্তু ট্রেনের এখনও অনেক দেরি আছে। ছাড়ার সময় তিনটে পঁয়তাল্লিশ। অতএব এখনও বোর্ড দেয়নি। সবাই ইলেকট্রনিক বোর্ডের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। যেন টিভিতে ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচ দেখছে। দেখি একজন বয়স্কমত লোক খুব আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে। পরনে ফতুয়া আর ধুতি। দুটোই ময়লা। তাকিয়ে আছে হাঁ করে। এরপর দেখি ঠোঁটদুটো অল্প অল্প নড়ছে, মনে হল বোর্ডে দেওয়া ট্রেনের বাংলায় লেখা নামগুলো বানান করে পড়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু বোর্ডে দেওয়া ট্রেনের নামগুলো বাংলা, হিন্দী, ইংরাজী এভাবে পর পর আসে। লোকটি একটু বানান করে আবার বাংলার জন্য অপেক্ষা করছে। বুঝলাম, সর্বশিক্ষা অভিযানের সুফল।

এবার এদিক-ওদিক একটু ঘোরাঘুরি করে একটি ট্রেনে উঠে পড়লাম। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় মনে হল—এটা ডায়মন্ড হারবার লোকাল দিতে পারে। ফাঁকা ট্রেন। অতএব আরাম করে জানলার ছোট ধারটাতে বসলাম। তারপর যা হয়, একটু ঝিমুনি আসতে লাগল। চোখ বুজে জানলার গায়ে মাথাটা ঠেকিয়ে ঝিমোতে লাগলাম। মিনিট দশেক পরে লোকজনের চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল। জানলার ধারে ছিলাম, প্রতিমুহূর্তে শুনতে হচ্ছিল—'আচ্ছা দাদা এটা ডায়মন্ড তো', 'এটা ডায়মন্ড দিয়েছে তাই না'? এসব প্রশ্নেই বোঝা গেল আমি ঠিক ট্রেনের ঘাড়ে চেপে বসে আছি। এর কয়েক মিনিটের মধ্যেই ট্রেনে লোক ভর্তি হয়ে গেল। আমার ঠিক পাশেই বসলেন এক সুদর্শন ভদ্রলোক। রঙ-ফর্সা, হাইট পাঁচ সাত তো হবেই। বয়স পঞ্চাশের আশেপাশে। বসেই বললেন—দাদা আপনি লাকি আছেন, আপনি ভাবলেন আর এটা ডায়মন্ড হয়ে গেল। আমি একটু মুচকি হাসলাম। আবার আমি একটু ঘুমোনোর প্রস্তুতি নিচ্ছি, ভদ্রলোক আবার বললেন-'এতক্ষণে স্টেশনে দাঁড়িয়ে একটা ঘটনা দেখছিলাম।' আমাকে কোনোরকম প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে আবার বললেন—'একটা লেড়কিকে টিকিট চেকার ধরেছে। লেড়কি বলছে—হামার কাছে এই বিশ রুপিয়া আছে। আমি নীলরতনে

ডাক্তার দেখাতে এসেছি।' ও লেড়কি আজকের ডেট মে প্রেসক্রিপসান ভি দেখাচ্ছে। বলছিল যে ওর বাড়িতে ওর হাজব্যান্ড আছে। ও ভি রোগে শুয়ে আছে। তাও ভি লেড়কিকে ছাড়ছে না। আমি আর থাকতে পারলাম না। এই লেডি চেকারকে ডেকে বললাম—'আপনি বঙ্গালের বাইরে কখনো পোস্টিং হয়েছেন?' তো উনি জানিয়ে দিলেন না হননি। আমি বললাম—'আপনি ইউপি কি ঝাড়খন্ডে পোস্টিং করিয়ে নিন। তাহলে জন্‌তা আপনাকে সমঝে দেবে যে তারা কি চায়।' এবার আমি মুখ খুললাম। বললাম—'আপনি কোন স্টেটের লোক?'

'আমি ইউপি (উত্তরপ্রদেশ)-র লোক। আজ বিশ বছর হল কলকাতায় আছি। একা থাকি।' উনি উত্তর দিলেন। আমি বললাম—কি করেন? ভদ্রলোক বলতে থাকলেন—'এই ছোটা মোটা বিজনেস আছে আমার। জুতা বানাতে যে চামড়া লাগে সেটা আমি সাপ্লাই করি। এজন্য বঙ্গালের বহু জায়গায় ঘুরতে হয়। আজকে হোটরে যাচ্ছি। তবে ভাই এই কলকাতার কালচার আমাদের থেকে অনেক ডিফরেন্ট আছে।' আমি জানতে চাইলাম—কিরকম? উনি বললেন—'এই যে আপনাদের শিয়ালদায় বোঙ্গোবাসী, সুরন্দরনাথ কোলেজ আছে, সেখানে দেখেছি লেড়কা লেড়কি একসাথ বসে আড্ডা মারে গল্প করে। এমন ব্যাপার আমাদের ওখানকার কলেজগুলোতে টু কি ফাইভ পারসেন্ট আপনি দেখতে পাবেন।' আমি বললাম—'ওখানে বলতে পুরো ইউপিতে নাকি ইউপি-র কছু কিছু অঞ্চলে।' উত্তরে বললেন—'আসলে কি আছে, ইউপি, বিহার আর ঝাড়খন্ডে অলমোস্ট সেম কালচার আছে।' এবার শুনতে শুনতে আমার ঘুম ছুটে গেল। ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হতে লাগল। এরপর আমি প্রশ্ন করতে থাকলাম আর ভদ্রলোক আনন্দের সঙ্গে সব উত্তর দিতে থাকলেন।

আমি—ওখানে কি ছেলে-মেয়ের মধ্যে প্রেম ব্যাপারটাই নেই।

ভদ্রলোক—'কি বলব দাদা। ওখানে জাত-এর ব্যাপারে খুব কড়া নিয়ম আছে। ধরুন, উঁচু জাতের কোনো মেয়ের সঙ্গে উঁচু জাতেরই কোনো ছেলে কলেজে বসে গল্প করছে। দু-পক্ষই ক্ষমতাশালী। এখন যদি মেয়ের বাড়ির কেউ দুজনকে একসঙ্গে দেখে ফেলে তবে, মেয়ের বাড়ি থেকে ছেলেটিকে ঠিকঠাক চম্‌কে দেবে। আর ছেলেটি যদি নিচু জাতের হয় তবে মেয়ের বাড়ির লোক ছেলেটিকে দুনিয়া থেকে হঠিয়ে দেবে।'

আমি—সে কি?

ভদ্রলোক—তো এতক্ষণ কি বলছি আপনাকে! এই কলকাতায় এসে খুব আফসোস হয়। আমরা যদি স্টুডেন্ট লাইফে এমন এনজয় করতে পারতাম।

আমি—তাহলে কি আপনাদের ওখানে প্রেম করে বিয়েই হয় না?

ভদ্রলোক—ধরুন একটি ছেলের সঙ্গে অন্য জাতের একটি মেয়ের ভালোবাসা হয়ে গেল। তবে দেখা যাবে যে মেয়েটির বাবা-মা মেয়েটিকে মেরে দিয়ে নিজেরা সুইসাইড করে। অন্যজাতের কারো সঙ্গে বিয়ে হওয়াটা ওরা এতটাই অসম্মানের বলে মনে করে। আর যদি ছেলে-মেয়ে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে তবে নিজেদের সম্মান রক্ষার জন্য ছেলে ও মেয়ে উভয়ের বাবা-মা-রা অনেকসময় সুইসাইড করে। কখনো বাবা-মা-রা নিজেদের ছেলে বা মেয়েকে মেরে ফেলে এর জন্য।

আমি—বাপরে, ওখানে মেয়ে হয়ে জন্মানোটাই তো অপরাধ, তাহলে।

ভদ্রলোক—আরে কি বলছি তবে এতক্ষণ। ওখানে একটা মেয়ে জন্মাবে মানে তার বাবা-মা ভিখারি হলেও অন্তত একলাখ টাকা জমাতে হবে।

আমি—অত টাকা কি বিয়েতে লাগবে?

ভদ্রলোক—আরে দাদা আপনি বিলকুল বোকা আছেন। বিয়েতে লাগবে মানে ওখানে দহেজ (পণ) ছাড়া বিয়েই হয় না। নয়তো ভিখারির জন্যও একলাখ টাকা জমাতে হবে কেন? অর ভি একটা ব্যাপার আছে। ঘরের যে বউ আছে, ও যিতনা পড়ি-লিখি হোক তাকে শ্বশুর ও শাশুড়ির সামনে মাথায় ঘোমটা দিয়ে মাথা নীচু করে বাত (কথা) করতে হবে।

আমি—আইবাপ, এ তো ডেঞ্জারাস ব্যাপার।

ভদ্রলোক—আচ্ছা আপনি কি ম্যারেড আছেন?

আমি—হ্যাঁ, তা আছি।

ভদ্রলোক—আচ্ছা আপনার আর আপনার ওয়াইফের মধ্যে কখনও ঝগড়া হয়েছে? ঝগড়া করে আপনার ওয়াইফ কখনো বাপের ঘর মে চলে গেছে?

আমি—হ্যাঁ তা দু-একবার এমন হয়েছে।

ভদ্রলোক—আপনার এই ছোটা লাইফের মধ্যে দু-একবার হয়েছে, মতলব বাদ মে আরো হবে। আমাদের ওখানে যদি কোনো লেড়কি হাজবেন্ডের সাথে ঝগড়া করে বাপ কি ঘর চলে যায়, তো ধরতে হবে তার ডিভোর্স হয়ে গেল। হাজব্যান্ড কখনো তার বউকে ফেরাতে যাবে না। আর লেড়কি যদি খুব লাকি হয় তবে ফার্স্ট টাইমের জন্য তাকে একবার ওয়ার্নিং দিয়ে ফিরিয়ে আনা হবে।

আমি—আমরা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এসব ভাবতেই পারি না।

ভদ্রলোক—একবার কি হয়েছিল, ইউপি কি ঝাড়খন্ডের একজন কাউন্সিলরের লেড়কি এক লেড়কার সাথে ভালবাসা করল। কাউন্সিলর পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে এ বিয়ে তিনি হতে দেবেন না। লেড়কি তখন

কলেজে ল (Law) সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশুনা শেষ করেছে। লেড়কি জানিয়ে দিল যে সে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করবে। কিন্তু লেড়কির কাউন্সিলর বাবা বলল যে—'আরে তুমি বাড়ির বাইরে যেতে পারলে তো তবে বিয়ে করবে।' এসবের পর ঐ কাউন্সিলর তখন নিজের লেড়কিকে সুট্ করে দিল।

আমি—সুট্ করে দিল মানে, আর্মস কোথায় পেল?

ভদ্রলোক—সে অর একটা কাহিনি আছে। আগে এটা শুনে নিন। এরপর ঐ কাউন্সিলর নিজের সব সিকিউরিটি গার্ডকে অর্ডার দিল যে, শহরে যত বড়া বড়া ডক্টর আছে তাদের ধরে আনতে।

আমি—কাউন্সিলরের সিকিউরিটি গার্ড কত, যে শহরের সব বড় ডাক্তারদের ধরে আনবে?

ভদ্রলোক—আরে দাদা ওখানে যিতনা বড়া লোগ আছে, সবকে সব শ সে হাজার গুন্ডালোগকো রাখতে হ্যায়, যাদেরকে আমরা সিকিউরিটি গার্ড বলি। আর আপনি বলছিলেন যে আর্মস কোথায় পেল? আসলে ওরা দু-পাঁচটা লাইসেন্সড আর্মস রাখে। আর এসবের পিছে থাকে শ-শ আর্মস যাদের কোনো লাইসেন্স নেই। আর সে সব আর্মস লোকাল থানা-পুলিশও কখনো দেখিনি। বেশিরভাগ ইমপোর্টেড। এই কয়েক বছর আগে লালুজির আমলে বিহারে তো সব মুদির দোকানে ওয়ান শটার বন্দুক পাওয়া যেত। এখন নীতিশজি এসে এসব প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে।

আমি—তার মানে নীতিশবাবু কমপ্যারেটিভলি লালুবাবুর থেকে ভাল কাজ করছেন?

ভদ্রলোক—আসলে নীতিশজি একটু ডিফারেন্ট রাস্তায় এগুলোকে হ্যান্ডেল করছেন। সাধারণভাবে কোনো মিনিস্টার কোনো পুলিশকে নির্দেশ দেন মিনিস্টারের অপছন্দের কাউকে মেরে দেবার জন্য। আর পুলিশ যদি সে কাজ না করে তবে তাকে বিভিন্নভাবে হ্যারাস হতে হয়। নীতিশজি-র নিয়ম যে অ্যান্টিসোসালদের সাফাই করুন এমনভাবে যাতে মিডিয়া না জানতে পারে।

আমি—আর পুলিশ যদি নীতিশজির কথা না মানে?

ভদ্রলোক—তাহলে পুলিশকে বিভিন্নভাবে হ্যারাস হতে হবে। উনি সি.এম. (চিফ মিনিস্টার) কিনা। কিছু ক্ষমতা তো আছেই (মুচকি হাসতে লাগলেন)। আরে যে স্টোরিটা বলছিলাম সেটাতো শেষ করতে দিচ্ছেন না।

আমি—ও হ্যাঁ বলুন। তারপর গুন্ডাগুলো কি অনেক ডাক্তারকে ধরে আনল?

ভদ্রলোক—আনল মানে একেবারে পাকড়িয়ে আনলো। এরপর ওই কাউন্সিলর ওই ডাক্তারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ডিগ্রিধারী এক ডাক্তারকে বলল যে—'আমার লেড়কিকে চেক করে এটা সুইসাইড কেস বলে লিখে দিন।' ডক্টর জানালে যে তাহলে ওনার চাকরি থাকবে না। কাউন্সিলর বললেন—'আপনি জান-এ বাঁচলে তো তবে চাকরি করবেন।' এসব ঘটনা আখবারে পাবলিশ হয়েছিল। নাইনটি সেভেন এইটের দিকে।

আমি—আচ্ছা আমরা শুনেছি ঝাড়খন্ডে অনেক মাওবাদী এলাকা আছে। এর কতটা সত্যি?

ভদ্রলোক—আরে আপনি ঠিকই শুনেছেন। ঝাড়খন্ডের ম্যাক্সিমাম এলাকাটাই তো মাওবাদীরা রুল (Rule) করে। শুনুন ঝাড়খন্ডে একটা বাড়িতে যদি তিনজন ছেলে জন্মায় তো ধরতে হবে তাদের একজন বেকার থাকবে আর বাকি দুজনের একজন মাওবাদী আর একজন পুলিশ হবে।

আমি—আচ্ছা মাওবাদীরা নিজেদের এলাকা নিজেরাই শাসন করে বলে শুনেছি। পুলিশ বা সরকারের নাক গলানো পছন্দ করে না।

ভদ্রলোক—আরে আপনি সহি শুনেছেন। নাক গলালে ওরা নাক কেটে দেবেই। (নিজের নাকে হাত দিয়ে বললেন) লেকিন হামার নাক এখোনো ঠিকঠাক আছে। আর একটা বাত আছে কি মাওবাদী এরিয়াগুলো জেনেরেলি আমরা যাদের লোয়ার ক্লাস পিপল বলি তাদের মধ্যে আছে। আর ওরা খুব গরীব আছে। ওরা যাদি ওদের মতো করে ভালো থাকে তবে গভর্মেন্ট কেন মাথা ঘামায় বুঝি না। এছাড়া অনেক হায়ার এডুকেটেড মানুষ গভর্মেন্টের চাকরি ছেড়ে দিয়ে মাওবাদী হয়েছে। অনেক মানুষ আছেন যারা মাওবাদীদের উপর ভরসা করে। সেটা বিশ্বাসে করতে পারে আবার ভয়েও করতে পারে। আপনাদের পশ্চিমবঙ্গালে যে বুদ্ধবাবুরা ইতনা দিন আছেন, কীভাবে? মানুষ ওদেরকে ভয় পায় সেজন্য নাকি বিশ্বাস করে, তাই। আমি এখানে বিশ বছর আছি। এ বুদ্ধবাবুর গভর্মেন্ট কি করল আম আদমির জন্য। আমার নজরে তো আচ্ছা কিছু পড়েনি। আর একটা কি ব্যাপার দেখেছি যে এখানকার জেনেরেল পিপল খুব ভীতু আর পুলিশকে দেখে খুব ভয় পায়।

আমি—কেন আপনাদের ওখানে কি পুলিশকে ভয় পায় না?

ভদ্রলোক—আরে ইউপি, কি ঝাড়খন্ডে পুলিশকে আম আদমি পাত্তাই লাগায় না। পুলিশ যদি কোনো এরিয়াতে বা গ্রামে ঢুকতে চায়, তবে পুলিশকে

গ্রামবাসীদের কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে যে কেন তারা ঢুকতে চায়? যদি জোর করে পুলিশ ঢোকে তবে গ্রামবাসীদের সঙ্গে পুলিশের ফায়ারিং হয়। যে দল হেরে যায় তারা জিতে যাওয়া দলকে স্যালুট জানায়। এমনও হয় যে লড়াই-এর জন্য অপোনেন্ট পার্টিকে আবার একদিন ইনভাইট করে। আপনাকে বলেছি না, ওখানে ছোটা মোটা আর্মস ঘরে ঘরে মেলে।

এসব গল্প করতে করতে ট্রেন ততক্ষণে বারুইপুর-কল্যাণপুর হয়ে দুর্গাপুর ঢুকছে। ভদ্রলোক হোটরে নামবেন সেজন্য সিট্ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ওনার সঙ্গে গল্প করে যে আমি প্রচন্ড খুশি সেটা আমি জানালাম। তারপর বললাম—'কিন্তু দাদা, আপনার নামটা তো জানা হল না।' উত্তরে ভদ্রলোক বললেন—'আরে নাম দিয়ে কী হবে? দাদা বলছেন যখন সেটাই বলবেন। তাছাড়া আমি বঙ্গালের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরি বিজনেসের জন্য। ফির কখনো মোলাকাত হয়ে যাবে।' ট্রেন ততক্ষণে হোটরে ঢুকে গেছে। ভদ্রলোক ট্রেন থেকে নেমে আমাকে বাই বাই করে দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। ট্রেন ততক্ষণে ধামুয়ার দিকে।

'যুক্তিবাদ' এবার পাঠ্য বইয়ে

ষষ্ঠ শ্রেণির 'সাধারণ বিজ্ঞান' বিষয়ের এই বইটিতে কুসংস্কারের প্রধান কারণ হিসাবে প্রচলিত ধর্মকে দায়ী করা হয়েছে। এতে খুব সহজভাবে সাঁইবাবার ফটো থেকে বিভূতি পড়া, জ্যোতিষশাস্ত্রের আসল রূপ, জন্ডিসের মালার রহস্য ইত্যাদি বোঝানো আছে।

লেখক বিষয়টিকে শেষ করেছেন এইভাবে—

"আমাদের সংস্কারমুক্ত, বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিবাদী হতে হবে। জানা দরকার পৃথিবীতে কোনও ঘটনা অলৌকিক ভাবে ঘটে না।"

বইটি ডা: এস. পি. মাইতি এবং প্রফেসর বি. প্রধানের লেখা। প্রকাশক 'শ্রী তারা প্রকাশনী' [T.B. No. : Syll/T.B./G.Sc./VI/04/ 54] নাম : "সাধারণ বিজ্ঞান"।

লেখকদ্বয়কে অভিনন্দন। আমাদের দীর্ঘদিনের আশা ও দাবী ছিল—যুক্তিবাদকে, বিজ্ঞানমনস্কতাকে ছোটদের পাঠ্যতালিকার অন্তর্গত করার। এবার অন্যান্য সব পাঠ্যবইয়ের লেখক-প্রকাশকরাও এগিয়ে আসুন।

—সম্পাদকমন্ডলী

২৬/১১ ফিরে দেখা

জয়ব্রত পন্ডা

২৬/১১, ২০০৮ তারপর ১ বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেল। এই দিনটাকেও মুম্বাইবাসী এবং ভারতীয়রা একরকম ভুলে গিয়েই এগিয়ে চলেছে। আপনারা অনেকেই বলবেন, কোথায় ভুলে তো যায়নি। এই তো ২৬/১১/২০০৯ দেখলাম প্রচুর লোক তাজ, ওবেরয় হোটেল এর সামনে এবং মুম্বাই এর রাস্তাঘাটে মোমবাতি জ্বেলে নিহতদের শ্রদ্ধা জানালো। দেশ ভক্তির গান ও পদযাত্রা হল, বড় বড় অভিনেতারা প্রোগ্রাম করে সন্ত্রাস এর বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখলেন। টিভি চ্যানেলগুলো শত শত লোকের ইন্টারভিউ নিয়ে ও পুরো ঘটনার নাট্যরূপ দেখিয়ে নিজেদের টি. আর. পি. বাড়িয়ে নিল, আমরাও সারাদিন সেইসব প্রোগ্রাম-এ মেতে রইলাম। এসব দেখে মনে হচ্ছিল মুম্বাইবাসী যেন এক আশ্চর্য শোকের উৎসবেই মেতে উঠেছে।

ব্যাস, এতটুকুই। কয়েক বছর পরে এই দিনটিতে এত তৎপরতার ছিঁটেফোটাও দেখা যাবে না। ১৭৩টি মানুষের মৃত্যু এবং ৩০৮ জন আহতের বেদনার তখন পথে নামার বা মোমবাতি জ্বালার মতো হয়তো ১০ জনকেও পাওয়া যাবে না। ঠিক যেমনভাবে মোম্বাইবাসী ভুলে গেছে ১৯৯৩-এর বোমা-বিস্ফোরণ এর ঘটনা যাতে ২৫৭ জন নিহত এবং ৭০০ জন আহত হয়েছিল। অথবা ২০০৬ সালের লোকাল ট্রেন-এ বোমা বিস্ফোরণ এর ঘটনা যেটাতে ২০৯ জন নিহত এবং ৭০০ জন আহত হয়েছিল। আসলে মুম্বাইবাসী খুবই দৃঢ়! কোনো সন্ত্রাসই কোনোদিন তাদের দমিয়ে রাখতে পারে নি। প্রতিটি ঘটনার পরই তারা ঠিক নিজেদের জীবনের গতি খুঁজে পেয়েছে। এরকম উৎসাহিত করার কথা প্রতিটি সন্ত্রাসবাদী হামলার পরই বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে বা রাজনৈতিক নেতাদের কাছ থেকে শুনেছি। তাই মুম্বাইবাসীরাও হয়তো একটু গর্বিত হয়ে নিজেদের পিঠ চাপড়ে নিয়ে সবকিছু ভুলে প্রতিবাদের পথ থেকে দূরে সরে এসেছে। কিন্তু এই কষ্টদায়ক দিনগুলো কি এভাবেই আসবে এবং যাবে? প্রতি বছর এই দিনগুলিতে এক অদ্ভূত শোকের উৎসবে না মেতে আমরা কি এর গুরুত্ব একটু অন্যভাবে বুঝে নিতে পারি না?

২৬/১১ এর মতো এই ঘটনাগুলোই দেখিয়ে দেয় আমার-আপনার মতো সাধারণ মানুষের জীবন কতটা মূল্যহীন। কিভাবে কয়েকটা মুষ্টিমেয় লোকের উপর

আমাদের বেঁচে থাকা নির্ভর করে। বাজেটে দেশের প্রতিরক্ষা খাতে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা মঞ্জুর করার পরও যখন দেখি তাজ-ওবেরয় এর মতো দেশের সবচেয়ে বড় হোটেলগুলোই সুরক্ষিত নয়, তখন আমরা, দেশের নব্বই কোটি মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও হতদরিদ্র মানুষেরা সুরক্ষিত এটা ভাবা এক আকাশ কুসুম কল্পনা।

২৬/১১ এর পর আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়নি। যেটা হয়েছে তা হল মহারাষ্ট্র ১ লক্ষ ৮৫ হাজার কোটি টাকা খরচ করে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র কিনেছে। সন্ত্রাস দমনের অজুহাতে রাষ্ট্রসংঘের গাইডলাইন-এর সম্পূর্ণ বিরোধীতা করে UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) নামে দেশের সর্বকালের সেরা কালা কানুন রচিত হয়েছে, যে আইনে আমাদের দেশের বেশ কয়েকজন নাগরিককে ধরা হয়েছে। আর যার জন্য সরকারের এই উদ্যোগ সেই কাসভ-এর জন্যও সরকার কম কিছু করছে না। আসুন তার অবস্থাটা একবার দেখি—

২৬/১১, ২০০৯ পর্যন্ত সরকার তার পিছনে ৩১ কোটি টাকা খরচ করেছে। (টাইমস্ অফ্ ইন্ডিয়া) তাকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৮.৫ লক্ষ টাকা খরচ করা হচ্ছে। আর্থার রোড জেল, যেখানে সে আছে সেখানে শুধুমাত্র তার জন্যই জেলের ভিতরেই বিচার ব্যবস্থার আয়োজন করা হয়েছে। কোটি টাকা খরচ করে জেলের ভেতর ওর জন্য দুটি স্পেশাল সেল বানানো হয়েছে যেগুলির দেওয়াল এত মজবুত যে ট্রাকভর্তি বিস্ফোরক এর বিস্ফোরণেও তার কোনো ক্ষতি হবে না। জে জে হসপিট্যাল-এ ওর জন্য স্পেশাল একটি বুলেটপ্রুফ ঘর বানানো হয়েছে কোটি টাকা খরচ করে। ওর বিভিন্ন ছোট বড় অসুখ-এর জন্য ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না, বরং এক বছরে ২৪টা বড় বড় ডাক্তার জেলের ভিতরেই ওর শারীরিক অবস্থা দেখে এসেছে। অর্থাৎ আমাদের থেকে অনেক ভালভাবে, সুরক্ষিত ও গোপনে তাকে রাখা হয়েছে। সেটাও আমাদের ট্যাক্সের টাকায় এবং আমাদের দেশের এত মানুষকে হত্যা করার পরও তাকে একজন মুখ্যমন্ত্রীর থেকে কিছু কম সুরক্ষা দেওয়া হচ্ছে না। আমরা সাধারণ মানুষ, খুব বেশি তো বুঝি না, এসব নিয়ে খুব একটা মাথাও ঘামাই না। কী জানি, হয়তো এসবের দরকার আছে। ১৬৬ জনের হত্যাকারী সমগ্র বিশ্বে পরিচিত খুব বড় মাপের অপরাধী কিনা। তাছাড়া এই হামলায় যে পাকিস্তানের হাত আছে তা প্রমাণ করার জন্য ওর থেকে বড় প্রমাণ আর কী বা হতে পারে? তাই হয়তো এই খাতির।

২৬/১১ এর ঘটনা আমাদের মধ্যে কিছু নতুন রহস্যের সৃষ্টি করে গেছে। কিছু ঘটনা যুক্তি দিয়ে বোঝারও প্রয়োজন আছে। হামলার দিন রাতেই ১২ ঘন্টার মধ্যে পুলিশ কাসভকে ধরে ফেলেছিল। তারপর ৩ দিন ধরে তাজ-ওবেরয় হোটেল এবং নরিম্যান হাউসে National Security Guard (NSG) এর সাথে জঙ্গিদের

মুখোমুখি লড়াই হয়েছে। পুলিশ কেন তখন কাসভকে জেরা করে তাদের বাকি সাথীদের কথা জানতে চাইল না? এটা অনুমান করাই যায় যে, এসব যায়গার বাইরে কিছু লোক ভিড়ের মধ্যে মিশেছিল যারা বাইরের পরিস্থিতি সম্বন্ধে জঙ্গিদের খবর দিচ্ছিল এবং পরে তারা পালাতে সক্ষম হয়। সেই সময় মুম্বাই শহরে পুলিশের কোনো ভূমিকা ছিল না। সেই ৩ দিন মুম্বাই দাপিয়ে বেড়ালো জঙ্গি ও NSGরা। ২৮/১১, ২০০৮ হামলার দুদিন পরে স্কটল্যান্ডের একটি প্রচলিত সংবাদপত্র খবর দিল—ঘটনাটির ব্যাপকতা দেখে মনে হচ্ছে ঘটনাটিতে প্রায় ১০০ জন জড়িত ছিল যারা এর পরিকল্পনা করতে এবং এটিকে ঘটাতে সাহায্য করেছে। নিরাপত্তা-বিশেষজ্ঞ বলেছেন, এটা খুবই আশ্চর্যজনক যে তারা এটাকে গোপন রাখতে সক্ষম ছিল। আরেকজন বিশেষজ্ঞ ব্রিটিশ সন্ত্রাসবাদ CNN চ্যানেলে জানালো ঘটনাটা এতটা সরল নয় যে ১০ জন বাইরে থেকে এসে ১০টা জায়গায় ৩০ মিনিটের মধ্যে হামলা চালালো।

জেলের আসামীদের মুখ খোলানোর জন্য পুলিশ যে কি হারে অত্যাচার করে তা আজ সকলেরই জানা। ইলেকট্রিক শক্ দেওয়া, নখে পিন ফোটানো, মল-মূত্র খাওয়ানো এসব অনেক কিছুই করা হয় যাতে অনেকসময় নির্দোষ ব্যক্তিরাও অত্যাচার এর হাত থেকে বাঁচতে অপরাধ স্বীকার করে নেয়। কিন্তু ২৬/১১ এর ঘটনার পরের তিন দিন বা তার পরে কাসভকে জেরা করে পুলিশ জানতে পেরেছে বা আদৌ কিছু জানতে চেয়েছে কিনা তা আমাদের জানা নেই। তার বক্তব্যের সত্যতা জানার জন্য কেন করা হয়নি তার নার্কো টেস্ট করার দাবী জানাচ্ছে না?

২৬/১১ এর মতো দুঃসাহসিক হামলা অর্থাৎ এরকম খোলাখুলিভাবে স্বয়ংক্রিয় রাইফেল নিয়ে গুলি চালানোর ঘটনা আগে কখনও হয়নি। তাই একে সবচেয়ে ভয়াবহ সন্ত্রাসবাদী হামলা বললেও ভুল হবে না। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল ১০ জন সশস্ত্র জঙ্গি যারা বাইরে থেকে এসেছে এবং মুম্বাই শহরের সাথে আগে থেকে পরিচিত নয় তারা একাই গোপনীয়তার সাথে মুম্বাই এর দশটা জায়গায় হামলা চালালো এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? খুব সহজেই অনুমান করা যায় স্থানীয় লোকেদের মদত ছাড়া এ কাজ এত ব্যাপক আকারে হতে পারে না। গোয়েন্দা চক্র যখন দেশের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে আছে তখন এত বড় একটা ঘটনার কোনো আগাম খবর তাদের কাছে ছিল না সেটাও কিভাবে মেনে নেওয়া যায়? আর যদি সত্যিই খবর না থাকে তাহলে এরকম গোয়েন্দা দফতরেরই বা কী প্রয়োজন আছে? ২৬/১১ রাত ৯টা নাগাদ হামলা শুরু হওয়ার পর, এটা যে জঙ্গি হামলা সেটা বুঝতেই পুলিশের আরো এক ঘন্টা সময় লেগেছিল। অথচ পরে জেনেছি বিভিন্ন দেশের গোয়েন্দা দফতর থেকে জলপথে এরকম একটা হামলার আগাম খবর ৪ বার মুম্বাই পুলিশের কাছে এসেছে। সতর্কবার্তা পেয়েও তারা কী ব্যবস্থা নিল? অন্যদিকে মুম্বাই পুলিশের বক্তব্য গোয়েন্দা বিভাগের সতর্কবার্তা তারা

পাননি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানতেন।

প্রতিটি পত্র-পত্রিকায় আমরা দেখে আসছি মুম্বাই হামলার একমাত্র জীবিত জঙ্গি কাসভ। কিন্তু শুধু কাসভই কেন? প্রথমেই তো শোনা গেছিল, জনা কুড়ি ছেলে জলপথে অস্ত্র নিয়ে ঢুকেছে। এদের সাথে নিশ্চয় আরো অনেকেই যুক্ত ছিল যারা অস্ত্রশস্ত্র পৌঁছে দিয়ে, থাকার জায়গা করে দিয়ে এদের সাহায্য করেছে। তাদের কী হল? না অস্ত্র হাতে সরাসরি হামলা করেনি বলে তারা অপরাধী নয়? ভারত সরকারের সাথে এই হামলার তদন্ত আমেরিকার ফেডারেল ব্যুরো অফ্ ইনভেস্টিগেশন (FBI)ও করেছে, যারা বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় তদন্তকারী সংস্থা হিসাবে পরিচিত। ১০ই জুলাই ২০০৯, শুক্রবার FBI তাদের তদন্তের প্রথম রিপোর্ট ভারত সরকারের কাছে পেশ করে। তাতে বলা হয়েছে দিল্লি ও মুম্বাইয়ের ৩০ জন ভিআইপি ও ভিভিআইপি-রা হামলার সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে সন্ত্রাস চলাকালীন কথোপকথন চালিয়েছে। ২৩ থেকে ২৮শে নভেম্বর পর্যন্ত ঐসব ভিআইপিদের ফোন থেকে ৯১টি কল করা হয়েছিল। কিন্তু খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে FBI এর এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর সেরকমভাবে কোনো সংবাদপত্র বা TV-তে তেমন গুরুত্ব সহকারে প্রচারিত হয় নি।

আমরা কবে প্রচলিত ধ্যান ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে প্রকৃত সত্যকে জানার, বোঝার চেষ্টা করব? ভারত একটি গণতান্ত্রিক দেশ এবং পাকিস্তান তার সবচেয়ে বড় শত্রু বা সন্ত্রাসবাদী মানেই মুসলিম এবং তারা হয় পাকিস্তান, আফগানিস্থান বা আরবের—কখন এই নির্বোধের ধারণা ঝেড়ে ফেলে বুঝব যে এর বাইরেও কিছু থাকতে পারে। কখন মানব যে কোনো দেশের সরকারের বিরোধীতা করার মানেই সেই দেশের বিরোধীতা করা নয়। আমরা কি ভারতীয় ভাবাবেগকে সম্পদ করে এটাই চাইব যে কাসভের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফাঁসি হোক নাকি নিরপেক্ষ থেকে এটা চাইব যে ২৬/১১-র সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি অপরাধীরই শাস্তি হোক তা সে আমার আপনার মতো সাধারণ মানুষই করুক VVIP বা VIP যেই করুক।

২৬/১১, ২০০৯ এর এক অনুষ্ঠানে দেখলাম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চদাম্বরম বলছেন সন্ত্রাস এর হাত থেকে কোনো দেশ সুরক্ষিত নয়। তাই আমাদের আরও বেশি সতর্ক হতে হবে। ঠিকই বলেছেন উনি। আমাদের আরও সতর্ক হতে হবে। নিজের দেশের ভালো খারাপ বুঝতে হবে। নিজের যুক্তি দিয়ে বিচার করতে হবে। গণতান্ত্রিক অধিকার মানে যে ভালো খারাপ বিবেচনা না করে প্রচলিত রাজনৈতিক দলগুলির যেকোনো একটিকে পাঁচ বছরে দুবার নিজে ভোট দেওয়া এবং পরবর্তী পাঁচ বছরে সেই দলগুলির প্রতিটি অন্যায় অবিচার অত্যাচার মুখ বুঝে সহ্য করা নয়—এটা বুঝতে হবে। আমাদের নিরপেক্ষ যুক্তিগ্রাহ্য সচেতনতাই হয়তো পরবর্তীকালে এক সুন্দর দুর্নীতিমুক্ত প্রকৃত গণতান্ত্রিক দেশের সূচনা করবে।

দেহব্যবসা ও কিছু অপ্রিয় প্রশ্ন

মানসী

৯ ডিসেম্বর ২০০৯, বুধবার। সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি দলবীর ভান্ডারী এবং এ. কে. পট্টনায়ক, মন্তব্য করলেন, এতদিনেও দেহব্যবসাকে বন্ধ করা যায়নি, অতএব একে আইনি-স্বীকৃতি দেওয়া হোক। —এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতেই আমার কিছু প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করছে।

১. আপনার ক্লাস ফাইভে পড়া ছেলে কিছুতেই পড়তে বসতে চায় না। আপনি কী করবেন? বাবা-সোনা বলে বোঝাবেন? না এক ঘা—দু ঘা দেবেন? না ‘‘উচ্ছন্নে যাচ্ছিস যা’’, বলে হাল ছেড়ে দেবেন?

২. ট্রেনে আপনি এক পকেটমারকে ধরেছেন। জিজ্ঞেস করলেন ‘‘এই তুই গতর খাটিয়ে খেতে পারিস না? পকেট মারিস কেন?’’ সে উত্তর দিল গতর খাটিয়েই তো খাই। পকেট মেরে আমি দিব্যি আছি। আপনি বাবু সৎপথে রোজগার করে যতটা ভাল আছেন প্রায় সেরকমই আছি।’’ আপনি কী করবেন তখন? পকেটমারটাকে সদুপদেশ দেবেন? না আচ্ছা করে ধোলাই দেবেন? নাকি নিজেও উৎসাহ পেয়ে পকেট মারতে শুরু করবেন?

৩. বাজারে গেলেন। মাপে কম দিল। আপনি প্রতিবাদ করবেন? না, ও এরকম একটু হয় বলে ছেড়ে দেবেন?

৪. আপনার মেয়ে রোজ স্কুলে যাবার সময়, একটি ছেলে ওর পিছু নেয়। বাজে বাজে কথা বলে। ওকে বিরক্ত করে। আপনি ছেলেটিকে দুটো চড় কষিয়ে শাসিয়ে দেবেন না মেয়ের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেবেন?

৫. খবর পেলেন আপনার মেয়েটা বখে গেছে। এ ও তার সাথে ফ্রি সেক্স করে বেড়ায়। আপনি তার পচে যাওয়া মানসিকতা থেকে উন্নত করার চেষ্টা করবেন? না, আইনি স্বীকৃতি হয়ে যাবে এই আশায়, বলবেন আরে ফ্রি কেন? টাকা নে। ‘‘ফেল কড়ি মাখ তেল’’।

তাহলে পরিস্কার বুঝতে পারছেন, আমাদের বাস্তব জীবনে যা ঘটে, কিছু কিছু সময়ে তার প্রতিবাদ করতে হয়। কাউকে ভালবেসে বোঝালেও যদি না শোনে তাহলে দু-ঘা দিতে হয়। অর্থাৎ যা কিছু খারাপ, তা কিছুতেই চলতে দিতে পারি না। সুতরাং মাননীয় বিচারপতিদের মন্তব্যকে যদি আমরা সমর্থন করি, তাহলে

অনেক দু-নম্বর পেশাকেই তো স্বীকৃতি দিতে হয়। কাল যদি ওয়াগন ব্রেকাররা সম্মেলন করে নেতাজী ইন্ডোরে এম.এল.এ., এম.পি.-দের জড়ো করে বলে, আমরা কষ্ট করে ওয়াগন ভাঙি। আমরা শ্রমিকের অধিকার চাই। পকেটমাররা মিছিল করে পথ হেঁটে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে জড়ো হল। সারা বিশ্বের ড্রাগ পেড্‌লাররা থাইল্যান্ডে গিয়ে সম্মেলন করল। চোলাই মদের কারবারিরা মুখে কালো কাপড় বেঁধে রাইটার্স ঘেরাও করল। বর্ডারের গরু পাচারকারীরা সংসদ ভবনের সামনে আমরণ অনশনে বসল।

এদের সকলের একটাই স্লোগান—

গতর খাটিয়ে খাই
শ্রমিকের অধিকার চাই।

হ্যাঁ, এমনই একটা হাস্যকর বিষয় নিয়েই কিছু বুদ্ধজীবিরা সওয়াল করছেন। দেহব্যবসাকে আইনি করার পক্ষে।

১. দুর্বার সংগঠনের তথ্য। বিশ্বের ২৭টি দেশে যৌনপেশাকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তাহলে বাকি রইল কয়টি? মনোরমা ইয়ারবুক ২০০৯-এর তথ্য অনুযায়ী মোট দেশের সংখ্যা ২০০। সুতরাং বাকি রইল (200-29) ১৭৩টি।

অর্থাৎ বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ এই জঘন্য পেশাটাকে সমর্থন করে না। এটাই প্রমাণ হল।

২. মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন মালিনী ভট্টাচার্য জানান, পেশাটাকে বে-আইনি বলা হয়নি। এর থেকে মুনাফা করাটা বে-আইনি বলা হয়েছে। আরে বাবা, যেকোনও ব্যবসা তো মুনাফার জন্যই করা হয়। আমি যদি এমন একটা ব্যবসার মুনাফা করি যা বে-আইনি, তাহলে তার সাথে সাথে ঐ পরিষেবাটা বে-আইনি হল। এটা তো খুব সহজ যুক্তি।

তিনি আরও বলেন দেহ ব্যবসায়িদের মানবিক অধিকারকে সুনিশ্চিত করা হোক। তার পর আইনি স্বীকৃতি দেওয়া হোক।

UNO দ্বিধাহীন ভাবে জানিয়েছে মানবিক অধিকার হল প্রতিটি মানুষের ‘‘উইথ ডিগনিটি’’—বাঁচার অধিকার। অর্থাৎ সম্মানের সঙ্গে বাঁচার অধিকার। কেন তিনি এই সুরে কথা বললেন না?

তার মতে যৌনব্যবসা একটি ‘‘পরিষেবা’। তাহলে ড্রাগ বিক্রিওতো পরিষেবা। ড্রাগ না পেয়ে যারা কষ্ট পায়, তাদের পরিষেবা দিয়ে কত উপকার করে বলুনতো!

৩. নারী আন্দোলনের কর্মী শাশ্বতী ঘোষ বলছেন কাজটি অপরাধ মুক্ত করার জন্য ভাবা উচিৎ। এর সাথে দুষ্টচক্র জড়িত। আচ্ছা মুশকিল। এতে ভাল লোকগুলো জড়িত হতে যাবে কেন? কাজটা খারাপ বলেইতো খারাপ লোক জড়িত। শাশ্বতী, আপনার কি মনে হয় একে আইনি স্বীকৃতি দিয়ে দিলেই ভাল

লোকগুলো দেহ ব্যবসায় নেমে পড়বে?

৪. মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য বলেন, আইনি না থাকায় অনেকেই পেশাটাকে লুকিয়ে চালায়। এতে অসুরক্ষিত যৌনতা প্রকাশ পায়। এটার কোন মানেই হল না, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সুরক্ষিত যৌনজীবন সম্বন্ধে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্কদেরই ধারণা থাকা উচিত। লুকিয়ে নোংরা কাজ করলে ক্ষতি তো হবেই।

৫. সোনাগাছি রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ স্মরজিৎ জানা। তিনি ভরসা করছেন সরকারের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ওপর। তিনি সোনাগাছি নিয়ে কী রিসার্চ করেন জানা নেই, বা কী ট্রেনিং দেন তাও বুঝতে পারলাম না। জানতে ইচ্ছে করে স্মরজিৎ জানার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ওপর এত ভরসা কেন? ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের ছাত্রীদের দিয়ে ডেমো প্র্যাক্টিস করাবেন?

মনে করুন দেহব্যবসা আইনি হয়ে গেল। তাহলে কী কী হতে পারে, আসুন দেখি।

১. কালকে আপনার ছেলে বলল, বাবা স্কুলগাড়ি ভাড়া দিয়ে লাভ কিছু হয় না। এই তেলখরচ, ড্রাইভার, মেকানিক, অ্যাক্সিডেন্ট সব মিলিয়ে কিছুই থাকে না। অতএব গাড়ি ছেড়ে নারী ধরব। আপনি ছেলেকে মত দেবেন?

২. আপনার মেয়ের সম্বন্ধ এসেছে। ছেলে কি করে? ‘‘রিসর্টে মেয়ে সাপ্লাই দেয়’’। সম্বন্ধটা পাকা করবেন তো?

৩. কাল আপনার স্বামী রাতে বাড়ি ফেরেনি। সকালে ফিরল। জিজ্ঞেস করলেন কোথায় ছিলে? উত্তর— ‘‘এই একটু ঐখানে গেছিলাম। আইনি হয়ে গেছে ভাল। না হলে গত বছরের মত পুলিশকে কত টাকা গচ্চা দিতে হত!’’ আপনি কি নির্বাক থাকবেন?

৪. আজ পেপারে হেড লাইন। দেহব্যবসার আইনি স্বীকৃতি অনেক টানাপোড়েনের পর। যৌনপল্লীর রত্না, কাবেরী, সুলেখা, শ্যামলীরা আবীর মেকে নাচানাচি। পত্রিকার প্রথম পাতায় তারই ছবি। আপনি ভীষণ খুশি। কত লেখালেখি করেছেন। ঠিক তখন আপনার ক্লাস নাইনে পড়া মেয়ে এসে আপনার খুশির কারণ জানতে চাইল। আপনি ওকে বোঝাবেন এই পেশায় আসার সুবিধাগুলো কোথায়? সে উৎসাহে চেঁচিয়ে উঠল ‘‘মা আমি বড় হয়ে বেশ্যা ডট্ ডট্ ডট্ হতে চাই।’’

আপনারা যতই বিষয়টিকে কু-যুক্তি দিয়ে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করুন না কেন, শেষে নিজের ফাঁসে নিজেই জড়িয়ে যাবেন। ‘‘নগরে লেগেছে আগুন আমার কি’’। এই ভেবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। কারণ মনে রাখতে হবে যে আগুনের আঁচ আমার ঘরে পৌঁছবে। সেদিন সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তখন ভাবার সময় থাকবে না। তাই শুরুতেই সজাগ থাকা ভাল। তাইতো সারা বিশ্ব জুড়ে চলছে তারই প্রতিবাদ।

একটি রিপোর্ট

১. খবরটা ৭ এপ্রিল, ২০০৬। প্রস্‌টিটিউশনের বিরুদ্ধে সরব হতেই ওয়ার্ল্ড কাপ বয়কট করল সুইডিশ ফুটবল ফেডারেশন। তারা মনে করে প্রস্‌টিটিউশনের ফলে বাড়ছে ট্রাফিকিং, বাড়ছে এইচ আই ভি ও এইডস। তাই তাদের দেশকে এসব থেকে মুক্ত করতে ফুটবলারদের প্রতিবাদ।

২. রাশিয়ার ইউক্রেন স্টেট। দিনে দিনে বেড়ে চলেছিল সেক্স ট্যুরিজম। তার বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন চালাল ইউক্রেনের কলেজ স্টুডেন্টরা। শরীরে শুধু বিকিনি, পায়ে হাই হিল, এবং প্রসটিটিউশনের সিম্বল লাগিয়ে পথে তারা প্রতিবাদ করল। হাতে প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার। তাতে লেখা,

"Ukrainian girls are not for sale." (ইউক্রেনের মেয়েরা বিক্রীর জন্য নয়)

"Ukraine is not a Brothel." (ইউক্রেন একটা বেশ্যালয় নয়)

৩. জ্যোহেন্সবার্গের একটি বিখ্যাত পত্রিকা ''ভান্ডারবিজল পার্ক স্টের'। এই পত্রিকাতে নিয়মিত একটি 'এডাল্ট সেকশন' নামে খোলাখুলি প্রস্‌টিটিউশনের বিজ্ঞাপন চলে। গত ১১ মে, ২০০৯ 'সল্ট গেম' নামক একটি খ্রিস্টান সংস্থা পত্রিকার সম্পাদককে চিঠি দেন। যেন তার ঐ পত্রিকা থেকে এই নির্দিষ্ট বিজ্ঞাপনের অংশটা সরিয়ে দেন। জোহেন্সবার্গের সমস্ত খ্রিস্টান কমিউনিটি এর বিরুদ্ধে সোচ্চার।

৪. কাজাকিস্থানের শহর ওস্‌। সিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। এই রিপোর্টে বলা হয় ওস্‌ শহরে প্রায় ৮০ শতাংশ অফিসিয়াল রেজিস্ট্রেশন আছে, যাদের HIV/AIDS হয়েছে। বাড়ছিল ড্রাগ বিক্রী ও ড্রাগ অ্যাডিক্টের সংখ্যাও। ফলে সিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একটি ক্যাম্পেইন চালু করে ডিসেম্বর মাস থেকে। যার সাথে যুক্ত হয়েছে ল এনফোর্সমেন্ট অফিসার, সাংবাদিক এবং বহু সাধারণ মানুষ। অভিনন্দন জানানোর মত ঘটনা!

৫. ক্যালিফোর্ণিয়ার শহর ভ্যাকাভিল। শহরে পুলিশ ও ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট শত তিন মাস ধরে স্টিং অপারেশন চালায় প্রসটিটিউশনের বিরুদ্ধে। অক্টোবরে মার্চেন্ট স্ট্রিট ম্যাসাজ পার্লার থেকে কয়েকজন গ্রেপ্তার হয়। নভেম্বরে অ্যারেস্ট করে একটি দম্পতিকে আনামো স্ট্রিটের একটি অ্যাপার্টমেন্ট থেকে। যারা বাড়িতেই গোপনে এই ব্যবসা চালাত। নিজেদের ঘর ভাড়া দিত।

৬. CATW একটি নিউইয়র্কের NGO। গত চার বছর ধরে নিয়মিত প্রচার ও প্রতিবাদ করছে পর্নোগ্রাফি, সেক্স ট্যুরিজম ও গণিকাবৃত্তির বিরুদ্ধে। অরগানাইজেশন- টির পুরো নাম কোয়ালিশন এগেইনস্ট ট্রাফিকিং ইন ওম্যান। এদের সাথে সাম্প্রতিককালে যুক্ত হয়েছে, EWL, ইউরোপিয়ান ওম্যানস্‌ লবি। এদের প্রতিবাদে সাড়া দিয়েছে আরো ১৩টি দেশ। বুলগেরিয়া, ক্রোয়েশিয়া, ক্রেজ রিপাবলিক্‌, এস্টোনিয়া, মোলডোভা, রাশিয়া, সার্বিয়া, আলবেনিয়া, লাতভিয়া,

লিথুয়ানিয়া, হাঙ্গেরি, কোসোভো, মন্টেনগ্রো ইত্যাদি।

সুতরাং বিশ্বজুড়েই যখন প্রতিবাদ তখন আমরাই বা হাত গুটিয়ে বসে থাকব কেন? এমন একটা জঘন্য ঘৃণ্য পেশাকে আমাদের দেশে চলতে দেব কেন? যা দাস প্রথার থেকেও ঘৃণ্য। পূর্বে দাস প্রথা চলত। অর্থের বিনিময়ে। এই অ-মর্যাদা থেকে রক্ষে করার জন্য দাস প্রথা তুলে দেওয়া হয়। এও তো দাসপ্রথার নামান্তর। 'ট্রাফিকিং' কথার অর্থই মানুষ কেনা-বেচা। যৌনব্যবসায় মহিলাদের কেনা হয় অর্থের বিনিময়ে বিকৃত কাম চরিতার্থ করার জন্য। সুতরাং এমন একটা পৈশাচিক, ঘৃণ্য জিনিস যা দাসপ্রথার থেকেও বহুগুণ খারাপ, তা আজকে একবিংশ শতাব্দিতে এসেও কী করে সমর্থন করবেন প্রিয় পাঠক? স্মরজিৎ জানার মত আরও যারা এটাকে সমর্থন করছেন তারা কি তাহলে বিশ্বব্যাপী নারীপাচার চক্রের সাথে যুক্ত আছে—এমনটা ভেবে নেওয়াটি ভুল হবে? এদের কু-যুক্তিতে ভুলবেন না।

কমিউনিস্ট রাশিয়া থেকে বেশ্যাবৃত্তি উঠে গিয়েছিল। তার জন্য ছিল অনেক সুপরিকল্পিত চিন্তাভাবনা। কোনও খদ্দের ধরা পড়লে নাম পরিচয় ও ছবিসহ পত্রিকায় প্রকাশ করে মর্যাদা ধসিয়ে দেওয়া হত। আর দেহ ব্যবসায়িদের নতুন জীবিকা হিসেবে গড়ে উঠেছিল নানা কর্মমুখি প্রকল্প। নেপাল দেহব্যবসাকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কেউ ধরা পড়লে শুধু জেল নয়। কড়া শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। ভারতের ৬০০ জেলার একতৃতীয়াংশ জেলায় স্বয়ম্ভর গ্রাম গড়ে উঠেছে। এইসব গ্রামে কোন দেহব্যবসা নেই।

আমরা আরও উন্নত সমাজ গড়ে তুলতে চাইছি। যেখানে মানুষে-মানুষে সম্পর্কটা কোনও অর্থের বিনিময়ে তৈরি হবে না। থাকবে সুন্দর ভালবাসার ও পারস্পরিক বন্ধুত্বের একটি সম্পর্ক।

জ্যোতিষীদের বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা

টাইমস অফ ইন্ডিয়া ১১ জানুয়ারি ২০১০ জানাচ্ছে এমন একটা খবর যা কোনও জ্যোতিষী আগে থেকে গণনা করে বলতে পারেনি!

মুম্বাইয়ের সংস্থা 'জনহিত মঞ্চ' সমস্ত জ্যোতিষী এবং বাস্তু, নিউমারোলজি, রত্ন ইত্যাদি দিয়ে ভবিষ্যত নির্ণয় করা, এমনকি পত্র-পত্রিকায় ও দূরদর্শনে ভবিষ্যত বাণী করার বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। মুম্বই হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা (PIL) দায়ের করা হয়েছে এবং এইসব ভুয়ো ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল কেস করে শাস্তি চেয়েছে মঞ্চটি। মামলাকারী ভগবানজী রায়ানি বলেছেন সরকার সংবিধান অনুযায়ী দেশের মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা বিস্তার করতে ব্যর্থ হয়েছে। এইসব প্রতারকদের ওপর কড়া পদক্ষেপ নেওয়া সরকারেরই কর্তব্য ছিল।

‘ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পশুবলি’

সন্তোষ শর্মা

“যখন দেবীর সম্মুখে বলির সকর্দম রক্ত সর্বাঙ্গে মাখিয়া সকলে উৎকট চীৎকারে ভীষণ উল্লাসে প্রাঙ্গণে নৃত্য করিতে থাকে তখন কি তাহারা মায়ের পূজা করে, না নিজেদের হৃদয়ের মধ্যে যে হিংসারাক্ষসী আছে সেই রাক্ষসীটার পূজা করে?”

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ধর্মের নামে নরবলি আগে হত। কিন্তু নরবলি বে-আইনি ঘোষিত হওয়ার পর, বিশেষত নরবলির ফলে অপরাধীকে ফাঁসি পর্যন্ত হতে পারে এই বার্তা পৌঁছে যাওয়ার পর নরবলি প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। যে কোনও ধরনের পশুবলিই শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বলি এক অমানবিক নিষ্ঠুর প্রবৃত্তি। নরবলি থেকে পশুবলি সব ক্ষেত্রেই অপরকে মেরে নিজেকে সুখী করার প্রবণতা, যা সমাজবদ্ধ মানবপ্রজাতির অগ্রগতির বিরোধী। একই সঙ্গে চলে বলির সংখ্যা বাড়িয়ে পাল্লা দেওয়ার রেষারেষির প্রবণতা।

এই অমানবিক এবং আইন বিরোধী প্রথা বন্ধের উদ্দেশ্যে ‘ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি’ এবং ‘হিউম্যানিস্টস অ্যাসোসিয়েশন’ একটি উদ্যোগ নিয়েছে। এই দুই সমিতির যত শাখা আছে সব শাখা নিজ-নিজ এলাকার ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পশু হত্যার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার কাজ করে চলেছে।

১১ অক্টোবর ২০০৫, মঙ্গলবার, আমাদের এই দুই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক প্রবীর ঘোষ, সুমিত্রা পদ্মনাভন সহ প্রায় ১০০ জন সদস্য-সদস্যারা বর্ধমানে উপস্থিত হয়েছে। উদ্দেশ্য বর্ধমান রাজবাড়ির প্রায় তিনশো বছর প্রাচীন সর্বমঙ্গলা মন্দিরে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা পশুবলির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, যুক্তিবাদী-মানবতাবাদীরা এই বছরে এই অভিনব প্রতিবাদ শুরু করেছে গত দু-মাস যাবৎ।

শুধু এই সর্বমঙ্গলা মন্দিরেই নয়, বলির ব্যাপারে কিছু-কিছু স্কুল-বিশ্ববিদ্যালয়ও পিছিয়ে নেই। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের মধ্যেই চৈত্র মাসে ওলাইচণ্ডী পুজোর দিন চলে বলি। বাঁকুড়ার সাড়াঙ্গপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়-এ মনসা পুজোর দিন চলে বলি। এছাড়া, বর্ধমান জেলার ভাতারের বড় বেলুন-এ একদিনে ১০

হাজারের উপর বলি দেওয়া হয়। বলির রক্তে এলাকা হয়ে যায় কর্দমাক্ত। এমনকি বর্ধমান থানার কুড়মুন গ্রামে গাজনের সময় সদ্যোমৃত মানুষের মুন্ডু কেটে নিয়ে উদ্দাম নৃত্য করা হয়।

সন্ধ্যায় এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। বিষয়, 'ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পশু-পাখি হত্যা বে-আইনি ও অসামাজিক'। এই সম্মেলনে **'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র সাধারণ সম্পাদক প্রবীর ঘোষ** জানান, প্রকাশ্যে পশু-পাখি হত্যা করা ''প্রিভেনশন অফ ক্রুয়েলটি টু অ্যানিম্যালস্ অ্যাক্ট, ১৯৬০'' অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যে কোন প্রত্যক্ষদর্শী এর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানালে, মন্দিরের পুরোহিত সহ পূজা কমিটির কর্মকর্তা ও বলিদানে অংশগ্রহণকারীরা পর্যন্ত গ্রেপ্তার হবে।

অনেকের ধারণা আছে ধর্মীয় কারণে বলি দিলে মানসিক শক্তির বিকাশ হয়। অথচ পুজোর নামে নৃশংস এই প্রথা কোনভাবেই মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করে না। দুর্বল ও অবলা প্রাণীদের যে নৃশংসতার সঙ্গে হত্যা করা হয় তাতে 'খুনী' মানসিকতার জন্ম দেয়। আর বলির ভয়াবহ দৃশ্য শিশুমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলে। এটা বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীদের এবং মনোরোগ চিকিৎসকদের মতামত। এর থেকে নানারকম মানসিক রোগ, ভীতি, নিদ্রাহীনতা হতে পারে।

আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে **'হিউম্যানিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন' এর সাধারণ সম্পাদক সুমিত্রা পদ্মনাভন** বলেন, ধর্মের নামে যতই স্বাধীনতা আমাদের সংবিধান দিয়ে থাকুক না কেন, যা মানুষকে পীড়া দেয়, দৃশ্য দূষণ ঘটায় বা শিশুমনে বিকৃতির জন্ম দেয়, এমন কাজ কখনই 'ধর্ম' হতে পারে না। পাবলিক নুইসেনস অ্যাক্ট (Public Nuisance Act) বা সংবিধানের ২৬ নং ধারা অনুযায়ী সব মানুষের দাবী হওয়া উচিৎ এই প্রথা বন্ধ করা।

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে আমরা কি তাহলে মাংস খাবনা? পরিবেশের ইকোসিস্টেম বজায় রাখার জন্য, খাদ্য-খাদক সম্পর্কের ভিত্তিতে অবশ্যই আমরা মাংস খেতে পারি। আমরা মাংসের দোকান থেকে মাংস কিনে খাই আমাদের শারীরিক চাহিদা মেটাবার জন্য। কিন্তু ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বলি দেওয়া হয়, 'আমাকে বা আমার পরিবারের কাউকে অসুখ থেকে ভাল করে দাও, ওকে মেরে ফেল-এর জন্য তোমার কাজে উৎসর্গ করব এই পশুটি'—এই ধরনের মানসিকতা থেকে। যা অমানবিক, নিষ্ঠুর এবং অবৈজ্ঞানিক চিন্তা করার ফসল। আমার ভালোর জন্য অন্য কাউকে বিপদে ঠেলে দেওয়া, প্রয়োজনে মেরে ফেলা এই চিন্তার-ই ফসল। যা নরবলি থেকে পশুবলি সবক্ষেত্রেই অপরকে মেরে নিজেকে সুখী করার প্রবণতা, যা সমাজবদ্ধ মানব প্রজাতির অগ্রগতির বিরোধী।

নিঃসন্দেহে আমাদের এই আন্দোলন ভারতের সর্বপ্রথম ধর্মীয় অনুষ্ঠানে

পশুবলির বিরুদ্ধে বড় আকারের আন্দোলন। আসুন, আপনারাও এই আন্দোলনের শরিক হোন।

"যে পূজার বেদি রক্তে গিয়েছে ভেসে
ভাঙ্গো ভাঙ্গো আজি ভাঙ্গো তারে নিঃশেষে।
ধর্ম কারার প্রাচীরে বজ্র হানো
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২ অক্টোবর ২০০৫ বুধবার :

ধর্মের নামে পশুবলি প্রথার বিরুদ্ধে দেবী সর্বমঙ্গলা মন্দির চত্বরে কাকভোরে নীরব প্রতিবাদ। যুক্তিবাদি সমিতি ও হিউম্যানিস্টস অ্যাসোসিয়েশন দুই শীর্ষ নেতা প্রবীর ঘোষ ও সুমিত্রা পদ্মনাভন সহ প্রায় ১০০ সদস্য সদস্যারা মুখে কালো কাপড় বেঁধে হাতে পোস্টার, ব্যানার নিয়ে মন্দির চত্বরে প্রদক্ষিণ করে মৌনমিছিলের মাধ্যমে। আমাদের হাতের পোস্টারে লেখা ছিল, 'ধর্মের নামে পশুবলি বন্ধ হোক, ধর্মের নাম পশুহত্যা মধ্যযুগীয় বর্বরতার পরিচয়। কুসংস্কার মুক্ত সমাজ গড়তে পশুবলি বন্ধ হোক। শুধু আইন করে পশু হত্যা বন্ধ করা যাবে না—চাই সচেতনতা। ধর্মের নাম পশু হত্যা আইনও দন্ডনীয় অপরাধ। গৌতমবুদ্ধ ধর্মের নামে পশুবলির বিরুদ্ধে ছিলেন'—ইত্যাদি। আমাদের এই মৌন প্রতিবাদ এবং মন্দিরে আসা ভক্তদের মধ্যে 'ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পশু-পাখি হত্যা বে-আইনি ও অসামাজিক' এই প্রচারপত্র মানুষকে প্রভাবিত করে। আর এই মন্দিরে সন্ধিপুজোর আগে পশুবলির বিরুদ্ধে যুক্তিবাদী-মানবতাবাদী এই আন্দোলনে জেলা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সেদিনের বহু টিভি নিউজে এবং পরের দিনের পত্রিকাগুলোয় গুরুত্বের সঙ্গে ছবিসহ খবরটি প্রকাশিত হয়।

এই অমানবিক ও অসুস্থ মানসিকতা তৈরি করার ক্ষেত্রে বলি যে সর্বনাশা ভূমিকা নেয়, তা প্রতিরোধ করতেই বলির বিরুদ্ধে এদেশে অনেকগুলি শাস্তিযোগ্য আইন রয়েছে। যথা :

ক) দ্য প্রিভেনশন অফ ক্রুয়েলটি টু অ্যানিম্যাল অ্যাক্ট ১৯৬০ (The Prevention of Cruelty to Animals Act 1960) (পশু-পাখির প্রতি নিষ্ঠুরতা বিরোধী প্রতিরোধ আইন-১৯৬০) অনুসারে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রকাশ্যে বলি দেওয়া নিষিদ্ধ। কোনও প্রত্যক্ষদর্শী ওই বলির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানালে মন্দিরের পুরোহিত সহ পুজো কমিটির কর্মকর্তা ও বলিদানে অংশগ্রহণকারীদের গ্রেপ্তার করা হবে।

খ) ওয়াইল্ডলাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট (Wildlife Protection Act) (বন্যপ্রাণী

সংরক্ষণ আইন) অনুসারে যে কোনও ধর্মীয় প্রথা অনুযায়ী প্রাণীহত্যা দন্ডনীয় অপরাধ। জেল এবং ২৫০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

গ) আর্মস অ্যাক্ট (Arms Act) (অস্ত্র আইন) অনুসারে লাইসেন্স ছাড়া বলি দেওয়ার অস্ত্র (খাঁড়া, চপার ইত্যাদি) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে মজুত রাখা বে-আইনি এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

ঘ) দৃশ্য দূষণ আইন (Public Nuisance Act) অনুসারে এই ধরনের বলি কারও চোখের সামনে দেওয়া যায় না। একই শ্রেণিভুক্ত প্রাণীর সামনে সেই শ্রেণিভুক্ত প্রাণীকে বলি দেওয়া যায় না। যেমন গরুর সামনে গরু; ছাগলের সামনে অন্য একটি ছাগলকে, মুরগীর সামনে মুরগীকে।

ঙ) গরু সংরক্ষণ আইন (কাউ প্রেটেকশন অ্যাক্ট) অনুসারে ধর্মের নামে পশুহত্যা নিষিদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গ হাইকোর্টের রায়ে বলা হয়েছে যে ঈদের সময় কুরবানী দেওয়া নিষিদ্ধ।

চ) ম্যাজিক রেমেডিস অ্যাক্ট (Magic Remedies Act) অনুসারে ধর্মীয় স্থানে মানত করে পশুবলি নিষিদ্ধ।

ছ) আদিবাসীদের উৎসবে পশুপাখি (যেমন—ময়ূর) শিকার করা অনুমোদিত নয়।

কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা, গুজরাট, হিমাচলপ্রদেশ এবং ঝাড়খন্ড প্রদেশে বলি ও কুরবানী দেওয়া নিষিদ্ধ। কোনও প্রত্যক্ষদর্শী এই রাজ্যগুলির যে কোনও অঞ্চলে বলি বা কুরবানী হতে দেখলে স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে এফ.আই.আর. (FIR) করতে পারে।

সংবিধানের ২৫-২৮ নং ধারায় যে কোনও ব্যক্তি তার বিশ্বাস অনুসারে ধর্মাচারে পালন করতে পারেন, কিন্তু সেটা যেন অন্যের আঘাতের কারণ না হয়। এই প্রসঙ্গে দুই রায় উল্লেখযোগ্য। আনন্দমার্গীদের প্রাণঘাতী অস্ত্র এবং নরমুন্ড নিয়ে উদ্দাম নৃত্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে সুপ্রিম কোর্ট (জগদীশ্বরানন্দ বনাম পুলিশ কমিশনার AIR 1984, Sc 51) এই রায়ে।

সুপ্রিম কোর্ট আরো একই রায়ে অভিমত দেয় যে, বকরি ঈদের সময় গরু কুরবানী দেওয়া মুসলিম ধর্মে প্রয়োজনীয় বিষয় নয় এবং কুরবানী আইনত নিষিদ্ধ। এটিকে জনস্বার্থে নিষিদ্ধ করা উচিত (মহ: হানিফ কুরেশি বনাম বিহার সরকার, AIR 1958, Sc 731)।

তামিলনাড়ু সরকার 'Tamil Nadu Animals & Birds Sacrifice Prevention Act' 1950 প্রয়োগ করে বলি বা কুরবানী নিষিদ্ধ করেছে। বাকি

রাজ্যগুলিও আন্তরিক উদ্যোগে বলি বা কুরবানী প্রথাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার কবে এরকম উদ্যোগ নেবে?

সোমবার ৩১ অক্টোবর ২০০৫ :

এরই মধ্যে বর্ধমান শহরের কেরহাট রক্ষাকালী মন্দিরে প্রায় ৮০ বছর ধরে চলে আসা ছাগ-বলি প্রথা বন্ধের বিরুদ্ধে পুজো কমিটির কর্তারা নোটিস ঝুলিয়েছে। তাতে লেখা হয়েছে, 'সর্বসাধারণের অনুরোধে বলি প্রথা বন্ধ হল'।

কমলাকান্ত কালী বাড়ির সম্পাদক অলোক মল্লিক জানালেন, 'আগে অনেক বলি হতো, এবার দুটো হচ্ছে এবং আমি সম্পাদক থাকাকালীন-ই বলি একদম-ই বন্ধ করে দেব।

বর্ধমান শহরের শতাব্দীপ্রাচীন উড়েকালী মন্দিরের সম্পাদক তারক দাস জানান, '২০০৬ থেকে আমাদের মন্দিরে বলি সম্পূর্ণ বন্ধ—একথা জানিয়ে আমরা নোটিশ দিয়েছি।' নোটিশ পড়ে শহরের বহু মানুষ জানিয়েছেন।

এদিকে নবদ্বীপের তেঘড়ীপাড়ায় একশো বছরের পুরনো বড়োশ্যামা মায়ের মন্দিরে আগামী বছর থেকে বলি বন্ধের জন্য পুজো কমিটির পক্ষ থেকে প্রচারপত্র বিলি করা হয়।

শনিবার ১০ ডিসেম্বর ২০০৫ :

বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজলঘাটী থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম সারঙ্গপুর। এই গ্রামের একমাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দীর্ঘ বছর ধরে মনসাপুজো ও বলি হয়ে আসছিল। খবর পাওয়ার পর যুক্তিবাদী সমিতির বাঁকুড়া শাখা থেকে অভিযোগ জানানো হল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে যাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তিনি এমন একটি বীভৎস বে-আইনী প্রথাকে দৃঢ় হাতে দমন করেন। The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 অর্থাৎ পশু-পাখির প্রতি নিষ্ঠুরতা বিরোধী প্রতিরোধ আইন, ১৯৬০, তো আছেই, তাছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানও বে-আইনী।

এরপর গ্রামের এক প্রতিনিধি শ্রী করুণময় ঘোষাল এবং পরে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক 'যুক্তিবাদী সমিতি'-র বাঁকুড়া শাখার সঙ্গে পর্যায়ক্রমে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলেন। পশুবলির কিছুদিন আগে 'তারা বাংলা' বিস্তারিত রিপোর্ট সংগ্রহ করল। গ্রামের লোকেদের সঙ্গে আলোচনায় তাদের বোঝান হল প্রকাশ্যে বিদ্যালয়ের সামনে পশুবলি বে-আইনী তো অবশ্যই, তাছাড়া এই বীভৎস দৃশ্য কোমল শিশুমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বিদ্যালয়ের ছোট্ট ছাত্র-ছাত্রীদের কথায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পশুবলির জমাট রক্ত তাদেরই পরিষ্কার করতে হয়, তাদের

এ কাজটা মোটেই ভালো লাগে না, তারা মানসিকভাবে অসহায় বোধ করে।

অবশেষে জয় এল। ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক আনন্দ। তাদের কাছে যুক্তিবাদী সমিতি যেন রবিঠাকুরের 'রাজর্ষি'। কারণ বলি বন্ধ।

শুক্রবার ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৬ :

আসন্ন কালীপুজোয় কলকাতার কালীঘাট মন্দির সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় মন্দির বা দেবালয়ে যাতে পশুবলি নিষিদ্ধ হয় সেজন্য আমাদের দুই সংগঠন যুক্তিবাদী-মানবতাবাদী সমিতি যৌথভাবে পথে নামছে।

কলকাতার কালীঘাটেও প্রকাশ্যে পশুবলির বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই কলকাতা মেয়র ও যুক্তিবাদী সমিতির আইনী উপদেষ্টা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমাদের সমিতির কথা হয়েছে। দুর্গাপুজোর পরেই এই ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে মেয়রও পা মেলাবেন বলে জানিয়েছেন। যুক্তিবাদী সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রবীর ঘোষ জানান, অস্ত্র আইন অনুযায়ী এই পশুবলির পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট পুজো উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুলিশ অথবা প্রশাসন এ ব্যাপারে মাথা ঘামায় না। তাই দুর্গাপুজোর পরেই আমাদের সমিতির তরফ থেকে জেলার বিভিন্ন পুজোর পুরোহিত ও পুলিশকে নিয়ে সচেতনতা শিবির করা হবে।

যুক্তিবাদী সমিতির বর্ধমান জেলা শাখার সম্পাদক সঞ্জয় কর্মকার জানিয়েছে, জেলার শিল্পাঞ্চলের কাজোড়া ও রাণিগঞ্জে ইতিমধ্যেই কাজ শুরু হয়ে গেছে। পুজোর পরেই গোটা জেলা জুড়েই পথে নামছেন পশুবলি বন্ধের জন্য।

হিউম্যানিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন-এর সাধারণ সম্পাদক সুমিত্রা পদ্মনাভন জানান, দুর্গাপুজোর পরেই যুক্তিবাদীর পুরুলিয়া শাখার পক্ষ থেকে বলিদান প্রথার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'বিসর্জন' নাটককে পথনাটিকায় উপস্থাপন করে জনসচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

শুক্রবার ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৬ : কালীঘাট মন্দিরে প্রকাশ্যে পশুবলি নিষিদ্ধ : কলকাতা হাইকোর্ট

প্রকাশ্যে কোনও রকম বলি দেওয়া যাবে না : কলকাতা হাইকোর্ট। কলকাতার মেয়র ও যুক্তিবাদী সমিতির উদ্যোগে কালীঘাটে জবরদস্ত এক কোপ পড়ল 'কালীপুজোর নামে চলতে থাকা কদর্য, অনৈতিক ও বেআইনী সব কার্যকলাপের উপর। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বিকাশ শ্রীধর শিরপুরকরের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, কলকাতার প্রাচীন 'ঐতিহ্য'পূর্ণ কালীঘাট মন্দিরে প্রকাশ্যে বলি দেওয়া চলবে না। কেননা বহু মানুষ ও শিশু বলি দেখে মানসিক ভাবে আহত

হন।

আদালতের রায় কার্যকর করার দায়িত্ব পুলিশ প্রশাসনের। কিন্তু আপাদমস্তক পুলিশি নিরাপত্তাতেই ঘটল আদালত অবমাননা। ঘটনাটি ঝাড়গ্রামের কাছেই জামবনী থানার অন্তর্গত চিল্‌কিগড় কনকদুর্গা মন্দির। দূর্গাপুজোর নবমীর দিন এখানে পশুবলির প্রথা অনেক প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তিবাদী সমিতি ও হিউম্যানস্টস্‌ অ্যাসোসিয়েশন-এর মেদিনীপুর জেলা কমিটি-র পক্ষ থেকে 'প্রকাশ্যে পশুবলি দেওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ' এই বক্তব্য যুক্ত একটি চিঠি এই দূর্গাপুজো কমিটিকে দেওয়া হয়। এবং তা কার্যকর করার আবেদন জানান হয়। অথচ দেখা গেল মন্দির কর্তৃপক্ষ স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসনের সক্রিয় সহযোগিতা নিয়েই, বলা ভালো আপাদমস্তক পুলিশি নিরাপত্তায় আইন ভাঙ্গল। আদালতকে অবমাননা করা হল। প্রকাশ্যে প্রায় তিন হাজার মানুষের সামনে পাঁচ-ছটি মহিষ এবং কয়েকটি ভেড়া বলি দেওয়া হল। উল্লেখযোগ্য, আমাদের সমিতির তরফ থেকে মন্দির কমিটি চিঠি পাওয়ার পর তারা আমাদের সদস্যদের ফোনে হুমকি দেয় যে, ঐ দিন মন্দির চত্ত্বরে এসে পশুবলির বিরুদ্ধে লড়ে দেখতে পারেন। আর আজ আমাদের সদস্যরা সাংবাদিকদের নিয়ে মন্দিরে পশুবলির ছবি তুলতে গেলে মন্দির কর্তৃপক্ষ লাঠিধারী যুবকবাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে পুলিশের সামনেই তাঁদের ছবি তুলতে বাধা দেয়। অভিযোগ, তারা সাংবাদিকদের মারধর করে। এ সবই তো 'রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট-২০০৫' (Right to Information Act 2005) অনুসারে দন্ডনীয় অপরাধ। পুলিশ-প্রশাসন, যাদের ওপর সুশাসন ও আইন রক্ষার ভার অর্পিত তাদের এই ধরনের আচরণ নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। আমরা এই ঘটনায় মন্দির কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকার তীব্র নিন্দা করছি এবং বিষয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হিউম্যানিস্টস অ্যাসোসিয়েশন-এর পক্ষ থেকে আশুতোষ রানা এবং শেখর দে এই মন্দির কমিটির বিরুদ্ধে জামবনী থানায় এফ.আই.আর. করে।

রবিবার ২২ অক্টোবর ২০০৬ : কালীঘাটে পশুবলি!

কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ সত্ত্বেও কালীঘাট মন্দিরে কালীপুজোয় প্রকাশ্যে পশুবলি দেওয়া হল। এই বে-আইনী কাজের বিরুদ্ধে আমাদের সমিতির তরফ থেকে কালীঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। প্রবীর ঘোষ বলেন, ''গত ১৫ সেপ্টেম্বর হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ রায় দিয়েছিল, প্রকাশ্যে পশুবলি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সেই নির্দেশ কালীঘাট মন্দিরে পান্ডাদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও শনিবার পশুবলি হয়েছে কালীঘাটে। নির্দেশ সত্ত্বেও সকলের সামনে কী করে পশুবলি হয় তা আমরা জানতে চেয়েছি।

উল্লেখযোগ্য আমাদের সমিতির সদস্যরা কালীঘাট মন্দিরে গিয়ে এই পশুবলির ছবি তুলে আনে। এই বে-আইনি কাজ করার বিষয়টি কলকাতার মেয়র বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য-কেও জানান হয়েছে।

বুধবার ১ নভেম্বর ২০০৬ :

উত্তর ২৪ পরগনায় কালীপুজোর আগে যুক্তিবাদী সমিতির উত্তর ২৪ পরগনা শাখার পক্ষ থেকে লোকাল থানা ও পুজো কমিটিগুলোকে চিঠি দিয়ে আবেদন করা হয় যে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ, 'প্রকাশ্যে কোনওরকম পশুবলি দেওয়া যাবে না' এই রায়কে মেনে চলার জন্য। বেশকিছু পুজো কমিটি আমাদের সমিতির আবেদনে সাড়া দিয়ে তাদের পুজোয় পশুবলি থেকে বিরত থেকেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, হাবড়া জিরাট রোড ব্যবসায়ী সমিতির পুজো কমিটি আমাদের চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষণা করে তারা আর পশুবলি দেবে না। যে সব পুজো কমিটি আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে পশুবলি থেকে বিরত থেকেছেন, তাদেরকে আমাদের সমিতির পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন। আদালতের রায়কে যারা অমান্য করেছে তাদের উদ্দেশ্যে সমিতির পক্ষ থেকে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ করা হয়।

শনিবার ২০ অক্টোবর ২০০৭ : চিল্‌কিগড় কনকদুর্গা মন্দিরে বলি বন্ধ

ঝাড়গ্রামের কাছেই জামবনী থানার অন্তর্গত চিল্‌কিগড় কনকদুর্গা মন্দিরে প্রকাশ্যে পশুবলি বন্ধ। গত বছর আমাদের সমিতির আন্দোলন হয় এবং চিল্‌কিগড় কনকদুর্গা মন্দিরে প্রকাশ্যে পশুবলি দেওয়ায় মন্দির কমিটির বিরুদ্ধে জামবনী থানায় এফ.আই.আর. করা হয়েছিল। এ বছর মন্দির কমিটি প্রচার করে যে মন্দিরে আর বলি হবে না।

এ সবই জনমতেরই জয়। শুভ শক্তির জয়।

বীরভূমের খবর : "আর প্রতারণা করব না"

এক ওঝা জন্ডিস সারানোর নাটক করছিল বীরভূমের লাভপুরে। তার হাঁড়ি ফাটালো যুক্তিবাদী সমিতির বীরভূম শাখা। খবরটি দেখানো হয়—সিটিভিএন চ্যানেলে সন্ধ্যে ৫.৩০-এ ই.টি.ভি.-তে দু দিন ধরে অনেক বার এবং এন.ই. বাংলা চ্যানেলে সন্ধ্যে ৬.৩০-এ। নেতৃত্বে ছিলেন অপূর্ব গুঁই, সৈকত সেন, আক্রাম, বাহাদুর ইত্যাদি যুক্তিবাদী সমিতির সদস্যরা। জনতার চাপে ওই ঠক জ্যোতিষী-তান্ত্রিক কার্তিকানন্দ মুচলেকা দেন 'আর প্রতারণা করব না।'

সংগঠন সংবাদ

১২ মে ২০০৯ : 'কে জিতবে? গণনা করলেই ২৫ লাখ—'প্রবীর ঘোষ-এর খোলা চ্যালেঞ্জ' লোকসভা ভোট-২০০৯-কে নিয়ে। (The freethinker, দৈনিক বিশ্বামিত্র, একদিন, The Statesman, The Economic Times-তে প্রকাশিত।)

২২ মে ২০০৯ : যুক্তিবাদী সমিতির চ্যালেঞ্জে জ্যোতিষী ডাহা ফেল (একদিন-এ প্রকাশিত)

৩১ মে ২০০৯ : 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' অনুষ্ঠান : পরিচালনায় 'বাগবাজার রিডিং রুম'। প্রবীর ঘোষের সঙ্গে প্রশ্ন-উত্তর পর্ব এবং সম্মোহন। সঙ্গে সন্তোষ শর্মা, মানসী, সুমন, অভিজিৎ, চৈতালী।

৪ জুন ২০০৯ : ঝড়ে পড়া গাছ উঠে দাড়াল! প্রবীর ঘোষের ব্যাখ্যা : দৈনিক বিশ্বামিত্র-এ প্রকাশিত।

২৩ জুন ২০০৯ : 'লালগড় ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস' নিয়ে প্রবীর ঘোষ-এর প্রবন্ধ The freethinker-এ প্রকাশিত। নতুন নাম www.srai.org.

৫ জুলাই ২০০৯ : বাঁকুড়া : নিজের বিয়ে-র বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য পদ্মা রুইদাসকে সম্মান জানান যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী সমিতি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রবীর ঘোষ, সুমিত্রা পদ্মনাভন, বিপ্লব (দৈনিক বিশ্বামিত্র, সংবাদ, বাঁকুড়া যুক্তিবাদী)।

২১ জুলাই ২০০৯ : 'সূর্যগ্রহণ ও কুসংস্কার' : এনডি টিভি ও টাইমস নাও-এর লাইভ প্রোগ্রামে প্রবীর ঘোষ।

১৩ আগস্ট ২০০৯ : ''বালকের উপর মনসার ভর'' প্রবীর ঘোষ-এর সাক্ষাৎকার Hindustan Times-এ প্রকাশিত।

২৪ আগস্ট ২০০৯ : 'হিজড়ের গুন্ডামি—পুলিশ দেখছে তামাশা' প্রবীর ঘোষ-এর সাক্ষাৎকার দৈনিক বিশ্বামিত্র-এ প্রকাশিত।

২৮ আগস্ট ২০০৯ : কল্যাণী গবর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' অনুষ্ঠান। অংশগ্রহণে প্রবীর ঘোষ, সন্তোষ শর্মা, সুমন, অভিজিৎ, অনিমা ও জয়।

৪ সেপ্টেম্বর ২০০৯ : মুখ থেকে বেরোচ্ছে কয়লার টুকরো। রহস্যের পিছনে যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা প্রবীর ঘোষের (একদিন-এ প্রকাশিত)

১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৯ : 'সর্বরোগ মুক্তি এক বুজরুকি : প্রবীর ঘোষ' একদিন-এ প্রকাশিত।

৫ অক্টোবর ২০০৯ : মুখ্যমন্ত্রীকে প্রবীর ঘোষের খোলা চিঠি। বিষয় : পুলিশী সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটির নেতা ছত্রধর মাহাতো সম্পর্কিত (একদিন-এ প্রকাশিত)।

৩১ অক্টোবর ২০০৯ : 'উপাসনার নামে বলি হচ্ছে পশু : সন্তোষ শর্মা'—প্রবীর ঘোষ-এর সাক্ষাৎকার। (প্রকাশিত অভয় বঙ্গ পত্রিকা : উৎসব সংখ্যা)।

১ নভেম্বর ২০০৯ : 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' অনুষ্ঠান, যুক্তিবাদী পুরস্কার বিতরণ এবং Guru Busters সিনেমা শো হয় সমিতির মথুরাপুর শাখায়। বিশেষ উদ্যোগ প্রণয় মন্ডলের পরিবার। পরিচালনায় অজয়, মৃণাল।

২৭ ডিসেম্বর ২০০৯ : হিজড়ে সম্পর্কে প্রবীর ঘোষের লেখা 'ছাপতে ছাপতে'-এর উপহার-এ প্রকাশিত।

১ জানুয়ারি ২০১০ : 'এনডি টিভি ইমাজিন'-এর 'রাজ পিছলে জন্‌ম কা'-কে প্রবীর ঘোষ-এর চ্যালেঞ্জ।

পূর্বজন্মের গল্পকথা নিয়ে গাঁজাখুরি এই অনুষ্ঠানটি শুরু হতেই ওয়েবসাইটে লেখা হয় প্রতিবাদ করে। প্রযোজক এটাকে বিজ্ঞান বলে চালাবার চেষ্টা করে; পরে নেহাৎ বিনোদন হিসেবে ক্ষমাঘেন্না করে দেওয়ার কথা বলে। কোনওটাই ধোপে টেকেনি পিনাকী ঘোষের জবরদস্ত উত্তরের মুখে। শেষ পর্যন্ত ১৫ জানুয়ারি ২০১০ তাড়াহুড়ো করে শেষ করে দেওয়া হল এনডি টিভি-র কোটি টাকা বাজেটের অনুষ্ঠানটি। ওয়েবসাইটে সিগনেচার ক্যাম্পেন শুরু হতেই এবং ১ জানুয়ারি ২৫ লক্ষ টাকার চ্যালেঞ্জের কথা জানাতেই নানা দেশ থেকে ই-মেল আসতে থাকে যুক্তিবাদীদের সমর্থনে। চাপ আসতে থাকে এনডি টিভি-র উপর, কুসংস্কার ছড়ানো এই বিদঘুটে অনুষ্ঠানটি তুলে নেওয়ার জন্য। এটা সমিতির বিশাল জয়। যেখানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষিত মানুষ পূর্বজন্ম-পরজন্মে বিশ্বাস করে অনুষ্ঠানটিকে প্রাথমিকভাবে জনপ্রিয় করেছিল, সেখানে বাংলার জনগণের এই উদ্যোগ, সমিতির বিভিন্ন শাখার সদস্যদের সহযোগিতা অভিনন্দনযোগ্য।

বাংলাদেশ : মহম্মদ ইউনূস

মনীশ রায়চৌধুরী

৯ ডিসেম্বর ২০০৯। ‘প্রফেসর হীরেন মুখার্জি মেমোরিয়াল পার্লামেন্টারি লেকচার’ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ‘গ্রামীণ ব্যাঙ্ক’ এর কর্ণধার মহম্মদ ইউনূস ভারতে এসেছিলেন। তিনি ‘সামাজিক বাণিজ্য’ বা ‘Social Business’ নামের নতুন আর্থসামাজিক প্রকল্প নিয়ে বক্তৃতা দেন।

তিনি বলেন, ‘‘এটি এমন এক ধরনের ব্যবসা যাতে ক্ষতিও হবে না, আবার খুব একটা লাভও থাকবে না। বৃহৎ সামাজিক লক্ষ্যে পৌঁছনোই এর লক্ষ্য। যাঁরা এখানে বিনিয়োগ করবেন, তাঁরা নিজেদের টাকা ফেরত পাবেন, কিন্তু কোনও লভ্যাংশ নিতে পারবেন না। লাভের অংশটি সংস্থার কাছেই থেকে যাবে। এই অর্থে কর্মসংস্থান স্বাস্থ্য পরিষেবা বা খাদ্য নিরাপত্তার মতো বিষয়গুলিতে নজর দেওয়া হবে।’’

তিনি যে সব প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করুন, সেই সমস্ত প্রকল্পগুলি হল :—

• গ্রামীণ ব্যাঙ্ক BSF নামক একটি জার্মান রাসায়নিক কোম্পানির সাথে যৌথ উদ্যোগে স্বল্প মূল্যে মশারি, কীটনাশক, ওষুধ সরবরাহ করবে।

• ক্ষেত-খামারে খালি পায়ে কাজ করা বহু কৃষিজীবি মানুষ পরজীবি ঘটিত রোগে আক্রান্ত হন। Grameen-adidas যৌথ উদ্যোগে কাজের উপযোগী জুতো উৎপাদন করবে।

• ব্যাপক কর্মসংস্থানের জন্য জার্মান গারমেন্ট কোম্পানির সাথে যৌথ উদ্যোগে বস্ত্রশিল্প গড়ে তোলা হবে।

• Grameen-intel মিলিতভাবে তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্র গড়ে তুলবে। কর্মসংস্থান ছাড়াও এখান থেকে দেশবিদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসাকেন্দ্র, আয়কর সম্পর্কে সুলভে তথ্য সরবরাহ করা হবে।

• শীঘ্রই Grameen Health Care Company নামের একটি বহুমুখী প্রকল্প শুরু হচ্ছে। এর মাধ্যমে অনেকগুলি নার্সিং কলেজ, হাসপাতাল, ডায়াগনস্টিক সেন্টার গড়ে উঠবে। শুরু হচ্ছে Health Insurance প্রকল্প।

এমন পরিকল্পনা কি ভারতও নিতে পারে না? নাকি ভারত শুধু ‘লেকচার’ শোনার মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখবে?

চি ঠি প ত্র

প্রিয় সম্পাদক,

যুক্তিবাদী 'হেমন্ত' সংখ্যা-০৯-এ রাণা হাজরার লেখা 'বিরোধীতার জন্যে বিরোধীতা নয়' প্রবন্ধটি পড়লাম। উল্লিখিত প্রবন্ধে রাণা বলেছেন, —'বহুজাতিক সংস্থাগুলি ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে কৃষকের থেকে উৎপাদিত দ্রব্য কিনে সরাসরি ক্রেতাকে বিক্রয় করলে অসুবিধা কোথায়?'

অসুবিধাটা হচ্ছে বাজারের নিয়ন্ত্রণের। বহুজাতিক সংস্থা যদি কাজটি করতে পারে তাহলে আমাদের সরকার কেন কাজটি করতে পারবে না। তাছাড়া আমরা যুক্তিবাদীরা যে মানুষ দ্বারা পরিচালিত সমবায়ের কথা বলি কাজটি সেভাবেই করা যেতে পারে।

রাণা বলেছেন, 'দেশী ও বিদেশী বহুজাতি সংস্থা টেলিকম ব্যবসায় নেমে পড়ল বলে টেলিকম ব্যবসায় যে প্রতিযোগিতার আবহ তৈরি হল, তাতে ক্রেতারা সস্তায় মোবাইল পেল।' এই প্রতিযোগিতার তত্ত্ব সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ এই তত্ত্ব সত্য হলে অন্যান্য ক্ষেত্রেও তার সুফল লক্ষ্য করা যেত, যেমন গৃহশিল্পে ব্যবহৃত সিমেন্ট, টিন, রঙ, লোহার দাম কমছে কই? কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত ট্রাক্টর, পাম্প বা কৃষিজাত বিজ, সার এর দাম কমছে কই? চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ঔষধ ও যন্ত্রপাতির দাম দিন দিন বাড়ছে দেশ বিদেশের কোম্পানির প্রতিযোগিতা থাকা সত্ত্বেও।

এবার আলুর ব্যবসা প্রসঙ্গে আসা যাক। আলু সাধারণত জমি থেকে বস্তা বন্দি করে হিমঘরে মজুত করে চাষীরা চুক্তির মাধ্যমে। এই চুক্তিপত্রকে 'বন্ড' বলে। এই বন্ডগুলি দালাল বা ফোড়েরা কিনে নেয়। বস্তাগুলি সাধারণত পঞ্চাশ কেজির হয়ে থাকে। বস্তাপ্রতি দাম হয় দেড়শ টাকা। এর সাথে লোড-আনলোড ও হিমঘরের ভাড়া ধরলে তা দাঁড়ায় দুশ থেকে দুশত্রিশ টাকা প্রতি বস্তা। সাধারণত আলুর দালাল বা ফোড়েরা পাঁচ হাজার থেকে এক লক্ষ বস্তার বন্ড কেনে বিভিন্ন চাষীর কাছ থেকে। যার মূল্য দাঁড়ায় দশ লক্ষ থেকে দু কোটি টাকা। এই বিশাল অঙ্কের টাকার যোগান দেওয়া সাধারণ ফোড়ে বা দালালদের সম্ভব নয়। আসলে এই দালাল বা ফোড়েরা তো মাধ্যম। মূল কলকাঠি নাড়ে পুঁজিপতিরাই।

অন্তত ১৫০০ গ্রাম সারা ভারতে ছড়িয়ে আছে যারা তৈরি করেছে স্বয়ম্ভর গ্রাম।

আমরা ঠিক এটাই চাইছি। জল, জমি, জঙ্গল ও বাজারের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকুক শ্রমজীবি সংখ্যাগুরু মানুষের। মুষ্টিমেয় কিছু পুঁজিপতির হাতে নয়।

সোনা শেখ
মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর

ভালো খবরও আছে, চোখ রাখি ডায়েরির পাতায়

তালাক নিয়ে হাইকোর্ট

কেরালা হাইকোর্টের বিচারক আর ভাস্করণ ও কে.পি. বালাচন্দ্রন এর ডিভিশন বেঞ্চ জানায়—'তিন তালাক' উচ্চারণ করে আর বিবাহ-বিচ্ছেদ চলবে না।

—অক্টোবর ৫, ২০০৫

গণতান্ত্রিক দেশে ধর্মভেদ ও জাতিভেদ নয় :

সুপ্রিম কোর্টের চিফ জাস্টিস আর. সি. লাহোটি-র ডিভিশন বেঞ্চ মত দেয় যে—ভারত গণতান্ত্রিক দেশ, মাইনরিটি কম্যুনিটি বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তালিকা বানিয়ে জাতিভেদ প্রথাকে স্বীকৃতি দেওয়া ঠিক নয়।

—আগস্ট ১০, ২০০৫

পাবলিক প্লেসে ধর্মজ্ঞান তৈরি নিষিদ্ধ : সুপ্রিম কোর্ট

সুপ্রিম কোর্ট দেশের সমস্ত রাজ্যকে চার সপ্তাহ সময় দিয়েছে যার মধ্যে রাজ্যকেই স্থির করতে হবে কী নীতি অনুসরণ করে তারা সরকারী জমিতে গজিয়ে ওঠা মন্দির, মসজিদ, মাজার, গুরুদ্বার ইত্যাদির মোকাবিলা করবে। এর আগে সেপ্টেম্বরেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে 'পাবলিক প্লেস'-এ বা পার্কে ধর্মীয় স্থান তৈরি করাকে।

—ডিসেম্বর ৮, ২০০৯

লটারি হঠাও : সুপ্রিম কোর্ট

গত ৭ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জানতে চেয়েছে—লটারি কেন নিষিদ্ধ ঘোষণা হবে না? গরীবদের জ্যাকপটের লোভ দেখিয়ে তিলে তিলে নিঃস্ব করার খেলা বন্ধ হওয়া উচিৎ।

—ডিসেম্বর ৮, ২০০৯

নবজাত সন্তানের কোনও ধর্ম নেই

টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া খবর দিচ্ছে মুম্বইয়ের অদিতি শেড্ডে এবং আলিফ সুর্তি—তাদের সন্তানের বার্থ সার্টিফিকেট-এ ধর্ম কলাম খালি রেখেছেন। তাঁদের বক্তব্য—আমাদের দেশ ধর্মনিরপেক্ষ। সন্তান বড় হলে তার নিজের ধর্ম বেছে নেবে। কোনও ধর্ম চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। অভিনন্দন। *(২৮.১২.০৯)*

এন ডি টিভি ইমাজিন-এর 'ইমাজিনেশন' বা কল্পনার দৌড় দেখে সত্যি চমকালাম

'রাজ পিছলে জনম কা' নাম দিয়ে পূর্বজন্ম নিয়ে একটা বেশ মোটা দাগের সিরিয়াল গত ৭ ডিসেম্বর ২০০৯-এ শুরু হতেই এস.এম.এস. এর ঝড়। আপনারা কী করছেন? প্রতিবাদ করুন। দেখলাম মোটামুটি যা বলতে চায় তা হল—পূর্ব জন্ম আছে—আর সম্মোহন করে সব জেনে ফেলা যায়। তবে যেভাবে তৈরি করা হয়েছে তাতে কেউ এতে প্রভাবিত হওয়ার সামান্যতম সম্ভাবনাও নেই।

খুব সাজগোজ করা এক মহিলা সম্মোহন করছেন—যে সম্মোহিত হচ্ছে তার অভিনয় এত কাঁচা যে পিটপিট করা চোখে ঘুম বা ঘুম-ঘুম লেশমাত্র নেই। আর তারপর যা হচ্ছ, পুরো নাটক। কাল্পনিক ঘটনা রিক্রিয়েট করে সিনেমার মত করে দেখান হচ্ছে। যেমন আগের জন্মে প্লেন-ক্র্যাশে মারা গেছেন—তো প্লেন ক্র্যাশের একটা সীল দেখানো হল। সাধারণ বুদ্ধি-সম্পন্ন কোনো মানুষ এই অনুষ্ঠান দেখে পূর্বজন্মে বিশ্বাসী হয়ে উঠবেন বলে মনে হয়না।

যারা তেলগি-র নার্কো টেস্ট এর ছবি টিভিতে দেখেছি, তারা জানি সম্মোহন ঘুম কেমন হয়। সত্যি সে একটা আধো ঘুম অবস্থায় চলে যায়; তখন তাকে জাগিয়ে জাগিয়ে প্রশ্ন করা হলে সে মনে যা আসে বলে যায়। তার মধ্যে সত্যি থাকে, কল্পনাও থাকতে পারে। নার্কো টেস্ট-এ ওষুধের সাহায্যে এই অবস্থাটা আনা হয়। আর সম্মোহনে সাজেশান দিয়ে এটা করা যায়।

সিরিয়ালটা দেখে মনে হলো কল্পনা আর গুল মিশিয়ে সেই মানুষটা যদি কিছু বলেও—তার সঙ্গেই বা পূর্ব জন্মের কী সম্পর্ক? আমরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নও তো দেখি। আমার এক বন্ধু তো স্বপ্নে প্লেন চালায়, ফুটবল খেলে, বাঘের সঙ্গে লড়াই করে—সত্যি! ঘুমের মধ্যে সে হাত পা ছোঁড়ে ও রীতিমত কথা-টথাও বলে। আমি তাহলে ভাবতে পারি সে আগের জন্মে গত শতাব্দীতে সুন্দরবনে বাঘের সঙ্গে লড়াই করেছে।

যাই হোক, এত সহজে মানুষ বোকা বনে না। বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে যে মেয়েটি, কাকলি, সে খুব উৎসাহ নিয়ে দেখে বেশ ধন্দে ছিল। আমার সঙ্গে আলোচনা করে বলল—'সত্যি তো—মরে গেলে তো চিন্তাই থাকবে না।

কী দিয়ে ভাববে?' তাকে বোঝালাম—স্মৃতি তো থাকে মস্তিষ্ক কোষে, আর এটা মরার পর আর থাকেনা। কী করে থাকবে? পুড়ে, পচে শেষ হয়ে যায়। আমরা যা ভাবি, সব এই জীবনেরই চিন্তা, ভাবনা, কল্পনা, সুপ্ত ইচ্ছা, শখ—এই সব। জেগে, ঘুমিয়ে, স্বপ্নে, সম্মোহনের আধা ঘুমে—যা যা ভাবি, দেখি সব এই জীবনেরই।

'আত্মা' বলে একটা কিছু শূন্যে ভেসে বেড়ায়—আমাদের স্মৃতিটাকে সঙ্গে নিয়ে—এটা কল্পনাই। এর কোনো সত্যতা প্রমাণিত হয়নি, বরং অসত্যতাই যুক্তিসঙ্গত। আমরা জন্মাবার আগেও কোথাও ছিলাম না, আর পরেও কোথাও থাকব না। তাই তো জীবনটা এত সুন্দর, এত মূল্যবান। থাকবে শুধু আমাদের কাজকর্মের প্রভাব, আমাদের অবদান। প্রিয়জনের মনে আমাদের স্মৃতি।

কাকলি রান্না করতে করতে বলে উঠলো—"এটা কী অন্যায় কথা বল—আগের জন্মে একজন অপরাধ করেছিল, আর তাই এ জন্মে তার ভোগান্তি হচ্ছে, এটা কাউকে বলাও তো উচিৎ না। সে কী বা করতে পারে? এরকম বিশ্বাস লোকের মনে ঢোকানোও তো ঠিক না, কি বল?"

আমি নিশ্চিন্ত হলাম। যাক, ক্লাশ এইট পড়া কাকলি যখন বুঝেছে, তখন আর চিন্তা নেই।

[.....পাঠককে অনুরোধ এখনো মনে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকলে প্রবীর ঘোষের "অলৌকিক নয়, লৌকিক" বইটার ৪র্থ খন্ডটা পড়ে ফেলুন। আর এরকম অনুষ্ঠানের প্রতিবাদ করুন। ফোনে, চিঠি দিয়ে জানান আপনার মতামত। অনেক প্রতিবাদ এলে বন্ধ হবে এইসব জঘন্য, ক্ষতিকর সময়ের অপচয়।]

—উপরের এই লেখাটি—'রাজ পিছলে জনম কা' নামক অনুষ্ঠানটি শুরুর পরেই www.srai.org-তে তুলে দেওয়া হয়। তারপর আরও অনেক প্রতিবাদ অনুরোধের পর শুরু হয় যুক্তিবাদী অভিযান। 'সংগঠন-সংবাদে' পরের ঘটনার কথা পাবেন।

হুগলি, শ্যাওড়াফুলির খবর

কয়েকশো বছর ধরে চলতে থাকা বলিপ্রথা অনুযায়ী যে অঞ্চলে নভেম্বরে হাজার হাজার বলি হত, সেখানে এলাকার মানুষদের চেষ্টায় এ বছর একটিও বলি হয়নি। অভিনন্দন নেতৃত্বে থাকা ও এক বছর ধরে অক্লান্তভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া, সেমিনার, আলোচনার মাধ্যমে স্থানীয় মানুষদের সচেতন করা মানবতাবাদী দিলীপ দাস মন্ডল এবং অবশ্যই সায়েন্স এন্ড কালচার ক্লাবের সদস্যদের।

ইউএপিএ বাতিলের দাবিতে মিছিল

ইউএপিএ বাতিলের দাবিতে মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি—ছত্রধর মাহাত, গৌর চক্রবর্তী, প্রসুন চট্টোপাধ্যায়, রাজা সরখেল, স্বপন দাশগুপ্ত, সুখশান্তি বাস্কেদের যে আইনের দোহাই দিয়ে আটক করেছে রাজ্য সরকার সেই ইউএপিএ আইন বাতিলের দাবিতে শুক্রবার মহাকরণ অভিযান করল আইন বিরোধী মঞ্চের সদস্যেরা। অবৈধ কার্যকলাপ বিরোধী আইন বাতিলের দাবিতে কলেজ স্কোয়ার থেকে এক মিছিল রানি রাসমণি রোড পর্যন্ত গিয়ে পুলিশের বাধার মুখে পড়ে। ইউএপিএ বিরোধী মঞ্চের (প্রস্তুতি) পক্ষে আহ্বায়ক সুজাত ভদ্র জানান অবৈধ কার্যকলাপ বিরোধী আইনে অভিযুক্তকেই প্রমাণ করতে হবে সে নির্দোষ। চার্জ গঠন করার আগে বিনা বিচারে আটকের বন্দোবস্ত রয়েছে এই আইনে। অভিযুক্তকে টানা ১৮০ দিন (যা প্রচলিত আইনের চেয়েও ৯০ দিন বেশি) বন্দি করে রাখা যাবে, পুলিশ হেপাজতে একটানা ৩০ দিন (যা প্রচলিত আইনের থেকেও ১৫ দিন বেশি) রাখা যাবে। সব মিলিয়ে এই আইন জনস্বার্থবিরোধী এমনটাই দাবি সুজাত ভদ্রের।

অন্যদিকে এই আইনে ১৮০ দিন জামিন পাবে না ইউএপিএ-তে আটক বন্দি। প্রচলিত আইনে আছে ৯০ দিন বা ৬০ দিনের মধ্যে চার্জশিট না দিতে পারলে অভিযুক্ত ৯১ বা ৬১ দিনের মাথায় জামিনে মুক্তি পাবেই। ইউএপিএ-তে ১৮০ দিনের পরেও জামিন পাবেন কি না তাও নির্ভর করবে বিচারপতির ওপর। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এই জাতীয় আইনে এই ভাবে আটকে রাখার সর্বোচ্চ সময়সীমা ৪৮ ঘন্টা থেকে ৭ দিন পর্যন্ত। এই আইনের ফলে নাগরিক সমাজকে পুলিশের চরবৃত্তি করতে হবে বলে ইউএপিএ বিরোধী মঞ্চের সদস্যেরা জানান। বিচার হবে গোপনে বিশেষ আদালতের ইচ্ছে মতো, দেশের যে কোনও স্থানে বিচার হতে পারে। এই আইনকে কালা আইন বলে অভিহিত করেছেন ইউএপিএ বিরোধী মঞ্চের সদস্যেরা। বিভিন্ন গণ সংগঠন এই আইন বাতিলের দাবিতে মিছিলে অংশ নেয়। বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে বিভাস চক্রবর্তী, অরুণ নস্কর, মীরাতুন নাহার, বোলান গঙ্গোপাধ্যায়দের সঙ্গে নিয়ে বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী সুজাত ভদ্র এই আইন রোধে মহাকরণ অভিযানে শামিল হন। মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী না থাকায় ডেপুটেশন দেওয়া থেকে বিরত থাকেন ইউএপিএ বিরোধী (প্রগতি) মঞ্চের নেতৃত্বরা।

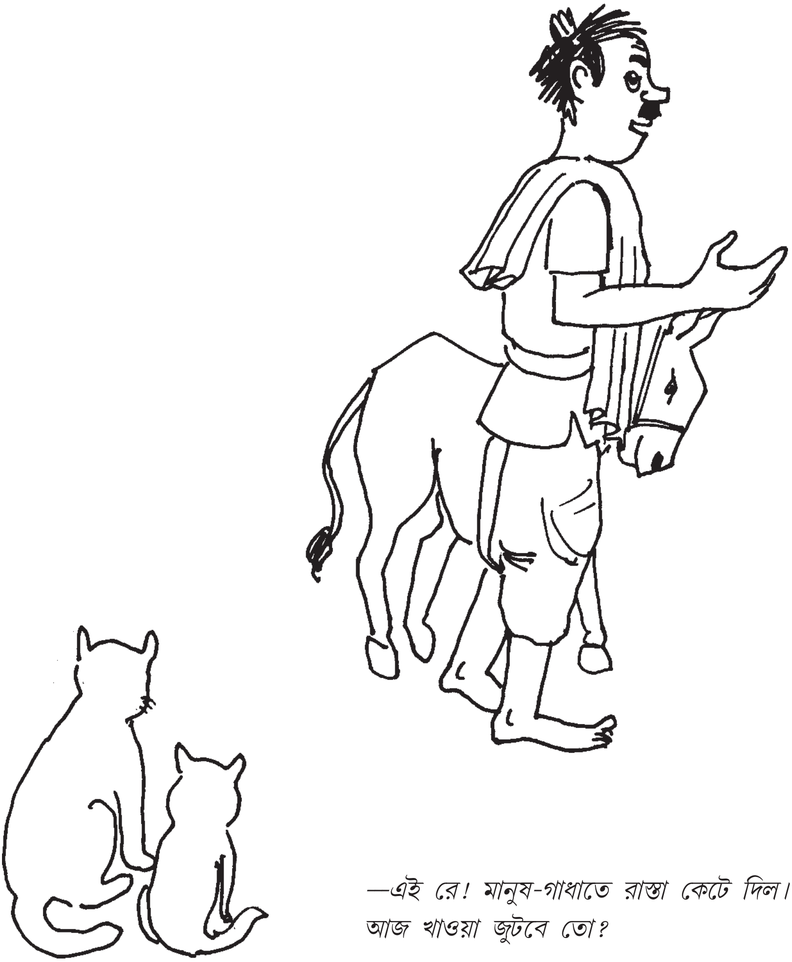

—এই রে! মানুষ-গাধাতে রাস্তা কেটে দিল। আজ খাওয়া জুটবে তো?

এবারের নতুন বই :

প্রবীর ঘোষ-এর

রাজনীতির ম্যানেজমেন্ট এবং আরও কিছু

৮০৲

সুমিত্রা পদ্মনাভন-এর

‘হট্টমালার দেশ’ অথবা যুগের হাওয়া

৭০৲

গেরিলা যুদ্ধের A to Z থেকে আজাদি

প্রবীর ঘোষ ও সুমিত্রা

যুক্তিবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ

প্রবীর ঘোষ-এর

মেমারিম্যান থেকে মোবাইলবাবা

১০০৲

মেমারিম্যান বিশ্বরূপ রায়চৌধুরী স্মৃতিধর এবং বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী। একবার শুনেই নাকি মুখস্থ করে ফেলেন ৭০-৮০ হাজার শব্দের ডিকশনারী। সত্যিই কি তিনি অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী? নাকি কৌশলে বোকা বানাচ্ছেন লক্ষ লক্ষ মানুষকে? আমাদের পরীক্ষায় ১৫-২০টি শব্দও মনে রাখতে পারছিলেন না? জানতে চান? রুদ্ধশ্বাস কাহিনি।

প্রবীর ঘোষের অন্যান্য বই

প্রসঙ্গ সন্ত্রাস এবং...১২৫৲

‘প্রসঙ্গ সন্ত্রাস’-এ এনেছেন ‘সন্ত্রাস’-এর নানা সংজ্ঞা। কী বলছে উইকিপিডিয়া, রাষ্ট্রসংঘ, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশ? ‘নেপাল’ প্রবন্ধে এসেছে মাওবাদীদের সশস্ত্র সংগ্রাম, তাদের গেরিলাযুদ্ধের তাত্ত্বিক ও প্রয়োগের খুঁটিনাটি। বিশ্লেষণ করেছেন ভারতের নানা জ্বলন্ত সমস্যা।

প্রসঙ্গ : প্রবীর ঘোষ

“অন্ধতা ও মূঢ়তার বিরুদ্ধে, অলীক বিশ্বাসের নামে প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে সে একা একটি সৈন্যদল।...এই কাজে প্রবীরের প্রাথমিক প্রেরণা এবং মূল্যবান নেতৃত্ব ঐতিহাসিক স্বীকৃতি লাভ করেছে।”

— ড. পবিত্র সরকার।

অলৌকিক নয়, লৌকিক

(১ম) ১৬০৲ (২য়) ১২৫৲ (৩য়) ২০০৲ (৪র্থ) ১২৫৲ (৫ম) ১০০৲

মনের নিয়ন্ত্রণ যোগ-মেডিটেশন১২৫৲

দে’জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ ফোন : 2219-7920
Fax : 2219-2041 e-mail : deyspublishing@hotmail.com

প্রধান সম্পাদক : সুমিত্রা পদ্মনাভন। সম্পাদক : মানসী, সন্তোষ, মৃণাল
ঠিকানা : ৭২/৮, দেবীনিবাস রোড, কলকাতা-৭৪, ফোন : (০৩৩) ২৫৫৯-০৪৩৫
• e-mail : prabir_rationalist@hotmail.com •
website : www.prabirghosh.tk, www.thefreethinker.tk,
www.juktibadi.tk
কলকাতা অফিস : ৩৩এ ক্রিক রো, মৌলালী, কলকাতা-১৪ থেকে প্রবীর ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত
স্টার লাইন : ১৯এইচ/এইচ/১২এ গোয়াবাগান স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৬ থেকে সুমন রায় কর্তৃক মুদ্রিত

আমরা যুক্তিবাদী

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি এবং
হিউম্যানিস্টস অ্যাসোসিয়েশন-এর মুখপত্র

বইমেলা সংখ্যা | জানুয়ারি ২০১০ | দাম : ১০ টাকা

ইউএপিএ বাতিলের দাবিতে মিছিল কলকাতায়

জাতিভেদের কুফল
বেআইনী বলিপ্রথা
দেহব্যবসা : কিছু অপ্রিয় প্রশ্ন

পলিটিকাল ম্যানেজমেন্ট
মুম্বই বিস্ফোরণ : ফিরে দেখা
পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র